★ আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ—১৯৮৫-৮৬

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের মিলিত প্রচেষ্টায় নাটক

কলেজে স্বতঃস্ফূর্ত রক্তদান

প্রকাশক
অধ্যাপক ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মুদ্রক
প্রিন্টেগ্রাফ—২৯ডি, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-২৬

প্রচ্ছদ অঙ্কন
শ্রীসুমিত চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
সিক্তরীনা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন বসু
" শ্রীঅমৃতাভ বন্দোপাধ্যায়
" শ্রীমৈনাক গুপ্ত
" শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়
" শ্রীবিনায়ক মিশ্র
" শ্রীমোহিনী মোহন আদক
মুদ্রনালয়ের কর্মচারীবৃন্দ

আমরা উত্থিত হবো মৃত্যুর মধ্যে থেকে
মৃত্যু হানবো মৃত্যুর উদ্দেশ্যে ॥

বিগত দিনে যাঁদের হারিয়ে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হলো
তাঁদের আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

কমঃ লে তুয়ান
কমঃ পি সুন্দারাইয়া
প্রকাশ সিং বাদল
টোনক্রেডো নেভিস
মুরতাজা ফজল আলি
স্নেহাংশু আচার্য
ললিত মাকেন
শম্ভু ঘোষ
রাজকৃষ্ণ
রাম চ্যাটার্জি
চন্দ্রশেখর সিং
প্রভাত মুখোপাধ্যায়
ওলফ্ পামে
অমিয় চক্রবর্ত্তী
জে কৃষ্ণমূর্ত্তি
নীতিন বসু
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়
অসীম রায়
আচার্য পৃথ্বি সিং
সুধীন্দ্রনাথ রাহা
রবার্ট গ্রেভস
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
গুলসন নন্দা
মধুমিতা মিত্র
জোসেফ ডি ওরিওলো
সঞ্জীব কুমার
শ্রীমতী আল্‌ভ মিরডাল
মুবারেক
শিবরাম শংকর
তেনজিং নোরগে
★ মেক্সিকোর ভূমিকম্পে যারা প্রাণ হারিয়েছেন।
জেনারেল বৈদ্য
★ সারা ভারত জুড়ে উগ্রপন্থীদের হাতে যারা প্রাণ হারিয়েছেন।
জগজীবনরাম
★ লাতিন আমেরিকার মুক্তি যুদ্ধে নিহত সংগ্রামী জনগণ।
★ দক্ষিণ আফ্রিকার খরায় নিহিত অসহায় মানুষ।

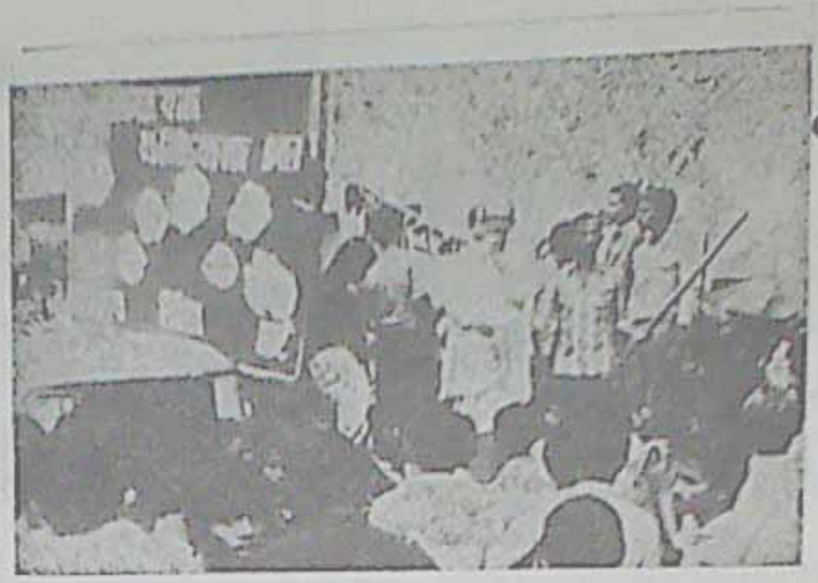

ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে মেট্রোরেলের কাজে ক্ষতিগ্রস্থ কলেজ ভবনের ক্ষতিপূরণের দাবীতে
'Metro Rail Movement'

চাই

★ সকলের জন্য শিক্ষা
★ সকলের জন্য কাজ
★ সকলের জন্য স্বাস্থ্য

আমরা

★ সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদ পন্থার বিরুদ্ধে
★ যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তির সপক্ষে
★ ভারতের ঐক্য, অখন্ডতা রক্ষা ও
★ পুঁজিবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে

আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

অধ্যক্ষ ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

এ বছরও (১৯৮৫-৮৬) আশুতোষ কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হলো। অধ্যাপকদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং ছাত্র-সংসদের কর্মতৎপরতা প্রকাশের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে। পত্রিকা প্রকাশনে বিগত তিনটি বছরের ধারাবাহিকতা এবছরও অব্যাহত রয়েছে।

অন্যান্যবারের মতো এবারও, বেশকিছু লেখা ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনক্ষমতার প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। আর্থিক অপ্রতুলতা সত্ত্বেও এবারের প্রত্রিকাটির অঙ্গ জুড়ে রয়েছে সাফল্যের সজ্জা। অন্যান্য বছরের সংখ্যার মতো এই সংখ্যাও আদৃত হবে—এই গভীর বিশ্বাস রাখি।

আশুতোষ কলেজ—১৯৮৬

প্রসঙ্গত

আমাদের কলেজ পত্রিকা বছরে একবারই প্রকাশিত হয়। সবসময়ই চেষ্টা থাকে পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার। এবার-ও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। জোর দিয়ে বলতে পারি, কোনো ক্ষেত্রেই আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। এছাড়া শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের যে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এবারে পত্রিকার অঙ্গসজ্জায় নতুনত্ব চোখে পড়তে বাধ্য এবং আশাকরি অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তা সমাদৃত হবে। আর একটা দারুণ খবর হ'ল, এবার যে সংখ্যক লেখা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, সেরকম আর কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না। ভালো লেখা বাছাইয়ের কাজটা যথেষ্ট শক্ত হয়ে পড়েছিল এবং এইখানেই অধ্যাপকেরা যেভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন তা ভুলবার নয়। বেশ কিছু লেখকই তাদের ভবিষ্যৎ সৃজন ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন এবারের পত্রিকার পাতায়। এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যে অগ্রসর, তারা যে ভাবতে পারে, চিন্তা করতে পারে, লিখতে পারে—এটা সুস্পষ্ট। প্রচ্ছদটি যাতে এবারে ভালো হয় সেদিকে নজর ছিল এবং আশা করি আমাদের কলেজের এক প্রাক্তন ছাত্রের আঁকা প্রচ্ছদটি সবারই ভালো লাগবে। পত্রিকা প্রকাশনায় যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেলে তা ক্ষমার যোগ্য হবে বলে আশা রাখি।

উপদেষ্টা মণ্ডলী

অধ্যাপক—শ্রীঅমল কুমার চক্রবর্তী
„ শ্রীভবানী শঙ্কর জোয়ারদার
„ শ্রীপ্রণব কুমার বসু
অধ্যাপিকা—শ্রীমতী রাইকমল দাশগুপ্ত

সম্পাদক—
সর্বজিৎ ঘটক

সহকারী সম্পাদক—
গৌরব মিত্র
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদন সহযোগী—
অনিরুদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়
শার্ঙ্গরব বসু মজুমদার
ভাস্কর রক্ষিত
অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা সেন
শান্তনু চট্টোপাধ্যায়
অমিত মিত্র
এ. শ্রীনিবাস
মৌসুমী রায়চৌধুরী
অর্ণব মাইতি

সূচী

কবিতা দক্ষিণা ॥ সরোজ কুমার অধিকারী, তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান। ৯
সংঘাত ॥ জয়দীপ সেন, দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান। ১০
যদিও বৃষ্টি ॥ অভীক ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় বর্ষ, কলা। ১১
হেসেছি কেঁদেছি ॥ মাধব মুখার্জী, দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান। ১১
শিশু ॥ ইন্দ্রনীল ব্যানার্জী, দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান। ১২
বন্ধুর সাথে বন্ধুর পথে ॥ শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান। ১২
সূর্য এবার জয়ের ভাষণ দেবে ॥ শান্তনু মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান। ১৩
গর্ত ॥ দীপঙ্কর ঘোষ, দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান। ১৩
আমিও এবং আমারও ॥ পল্লব সাহা, একাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান। ১৩
এখনো রাত ॥ অধ্যাপক অমল চক্রবর্তী। ১৪
ত্রি-নয়ন ॥ অধ্যাপক ডক্টর দেবদাস রায়। ১৫
অঙ্গীকার ॥ শার্ঙ্গরব বসু মজুমদার, দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান। ৬৪
উনিশশো ছিয়াশির প্রতি ॥ শুভদীপ প্রামাণিক, প্রথম বর্ষ, কলা। ৬৪

প্রবন্ধ শিক্ষার বিস্তার : রবীন্দ্রনাথ : জাতীয় শিক্ষানীতি ॥ ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী। ১৭
মে দিবসের ইতিহাস ও বর্তমান তাৎপর্য ॥ নীলাঞ্জনা সেন, তৃতীয়বর্ষ, কলা। ২২
পকেট কাটা হাত ওঠাও ॥ গণদেব চক্রবর্তী, দ্বিতীয়বর্ষ, বিজ্ঞান। ২৬
নজরুল-প্রিয় বুল বুল ॥ অধ্যাপক স্বপন কুমার দাস। ২৯
অবলম্বন ॥ শিবশঙ্কর ব্যানার্জী, দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান। ৩৫
রবীন্দ্রচর্যা ॥ অধ্যাপক অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৮
শিল্প সংস্থায় কম্পিউটার স্থাপন-একটি পর্যালোচনা ॥ অনিরুদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়, ২য় বর্ষ বিজ্ঞান ৪১
ঐতিহাসিক মে দিবস ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ॥ প্রিয়জিৎ ব্যানার্জী,
দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান। ৪৬
ইতিহাসের আলোকে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ॥ উত্তর সারথি গুহ মজুমদার, ২য় বর্ষ, কলা ৫০

গল্প বাবু ॥ অরূপ পাল, দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান। ২৫
টিভি ॥ সঞ্জয় মুখার্জী, একাদশ শ্রেণী, কলা। ৩৩

Poems The Wayfarer—Ashish Das, 2nd Yr. Science. 1
Life We Have Been Long Together--Jaydeep Mukherjee, 2nd Yr. Arts. 2

Essays The Hurdle Of Languge In India : A Suggestive Appraisal
—Amit Mittra, 2nd Yr. Science. 3
Diet And Diabetes—Shampa Chandra, 1st Yr. Arts. 5

দক্ষিণা

—সরোজ কুমার অধিকারী

আবার ঘুরছে চিল : পরাক্রান্ত ঝড়
একটি শতাব্দীর—
জন্ম মৃত্যুহীন সব মুহূর্ত ভেঙে যায়
শুধু তুমি বসে থাকো নির্বিকল্প উদাসীন
সব মুহূর্ত ভেঙে যায়
ভেঙে যায় অকূল সাগর আর ফেনিল সংসার !

দু'একটি বালক বর্ষা এনেছিল ঠিক নিশুতি রাতেই
ভেসে যায় তাই নক্ষত্রের মত জনগণ
প্রচণ্ড রাত : আর পরাক্রান্ত ঝড় !
আবার অসংখ্য পরিহাসে চপল বাতাস
স্বাধীনতার সূচনায় 'সূর্য' আনে—
বর্ষার মত বালকেরা হেঁটে যায় বসন্তের দিকে
দু'একটি নিষ্পাদপ পথের নির্জনতার স্বাদ
আরো লাল লাল মজ্জা সৃষ্টি করে
সৃষ্টির-ই বেদনায়
লতানে আঙুলের পরিমিত ক্লান্তিতে—

তারপর তোমারই পূজাশেষে ঐসব বালকেরা
বলির পাঁঠার মত দাঁড়িয়ে থাকে
দূরের কালো নদীর লাগোয়া অরণ্যের বুকভাঙা আর্তনাদে
দু'একটি স্বাধীন আকাশের নিশ্চিত বাসনায়
মানবিক প্রত্যয়-হারা তুমি-ই উদাসীন
কেননা তখন
ওদের দু'হাতে ছিল কিছু কিছু উচ্ছিষ্ট নিগ্রো বীজ ॥

সংঘাত

—জয়দীপ সেন

হঠাৎ এক ঝলক সোঁদা বৃষ্টি এসে মনটাকে
কীরকম ভিজিয়ে দিয়ে গেল, খুলে দিয়ে গেল এক রুদ্ধ দুয়ার।

বহুদিনের পুরানো সব স্মৃতি যেন বার হয়ে এল
অগ্ন্যুৎপাতের মতন, চারিদিকে লাভার সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত
পাথর আর ছাইয়ের মত
এলোমেলো চিন্তাকে উগরে দিয়ে।

পশলা পশলা বৃষ্টির সাথে দু-এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস
মাটির সোঁদা গন্ধটাকে নিয়ে,
নিয়ে ভিজে গাঁদাফুলের মিষ্টি সুবাস,
কিছুদূরের আঁস্তাকুড়ের ক্ষীণ পচা গন্ধটাকেও নিয়ে
ক্ষণে ক্ষণে এসে,

নিয়ে যাচ্ছিল কোন এক নাম না জানা অজানার দেশে ;
যেখানে কল্পনাকে ছেড়ে দিনে স্মৃতির সায়রে
দূর সুদূরে যাব ভেসে।
কিন্তু কিছু বর্তমান চিন্তা এসে উঁকি মারতে লাগল
জিলিপির মতন প্যাঁচালো মনটার পাকদণ্ডীর বাঁকে
বারবার বলে গেল ফিসফিস করে, এমাসের মাইনের
অনেক দেরী আর—
কালকে অফিস।

যদিও বৃষ্টি

—অভীক ভট্টাচার্য

আজ সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে
ক্রমাগত কালো আকাশ থেকে।
কখনো পালক— ধুয়ে
কখনো কেবল ফোঁটায়—ফোঁটায়—
একবারও থামে নি।
সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত
একবারও সূর্য দেখা যায় নি।
যদিও বৃষ্টি মিঠে লাগে,
সূর্য ছাড়া কি বাঁচা যায়?

আজ সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে
গাছের পাতায়, রাজপথে, গলিতে,
টাটাসেন্টারে, চা-য়ের দোকানে, চন্দনচিতায় .....
সন্ধ্যার ভিজে ঘাস বেয়ে
বিদগ্ন ছায়াযোদ্ধারা সব চার চাকায়
গড়িয়ে যায়।
যদিও বৃষ্টি ভালোবাসি
রোদ না পেলে কি চলে?

আশা করা যাক,
আজ সারা রাত ধরে
আকাশের সব মেঘ শেষ হয়ে গেলে
কাল সকালে আবার সূর্য দেখা যাবে।

হেসেছি কেঁদেছি

– মাধব মুখার্জী

আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লেখ
বলেছিল একটা ফুল।
একটা প্রজাপতি—
সেও করেছিল ঐ একই অনুরোধ
আবার সেদিন—
একটা ল্যাংটা খোকা
আলের উপর দিয়ে ছুটে যেতে যেতে
নিরবে বলল—
একটা কবিতা লেখনা আমাকে নিয়ে,
তাদের অনুরোধে--
চেষ্টা করেছিলাম—
এক একটা রসালো কবিতা লেখবার—

কিন্তু—
কেমন যেন—
ওলট পালট হয়ে গেল—
শয্যাশায়ী ঐ জীর্ণ বৃদ্ধাটিকে দেখে
ওলট পালট হয়ে গেল—
ঐ ভিখারীটাকে দেখে
ওলট পালট হয়ে গেল—
বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর পেতে পড়তে বসা
ঐ রোগা ছেলেটাকে দেখে।

পারিনি—
একটাও কবিতা লিখতে—
ভালো-মন্দ কিংবা সুন্দর কুৎসিতের।
কেবল দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
কেঁদেছি হেসেছি
হেসেছি কেঁদেছি !!!

শিশু

—ইন্দ্রনীল ব্যানার্জী

নিরন্ন আমার দেশ,
অশিক্ষার অন্ধকারে ভরা ;
এখানে ফুটপাতে জন্মায় শিশু,
সেখানেই বেড়ে ওঠে—
এককণা উচ্ছিষ্টর জন্য ডাষ্টবিনে
মানুষে কুকুরে নিয়ত কাড়াকাড়ি।
পৃথিবীর মানুষের কাছে
এভাবেই পরিচিত আমার জন্মভূমি—
তবু তারই জন্য একবুক ভালবাসা নিয়ে
পথ চলি আমি।

যখন দেখি,
সেই পথের একধারে বসে
ইটের ফাঁকে কুড়ানো কাঠখুঁটোর আগুন জ্বেলে
মা বসিয়েছে মাটির হাঁড়িখানি,
যাতে শেষ হচ্ছে কোনো বাজারের ফেলে যাওয়া
পচা কিছু সবজী, আর
ভিক্ষেয় পাওয়া চাল—
মাকে ঘিরে বসে আছে বুভুক্ষু সন্তানের দল
লোভীর মত সেই হাঁড়ির দিকে চেয়ে।
তীব্র বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে বুক
মুখ ফিরিয়ে দ্রুত হেঁটে রাস্তা পার হই
অপরাধী মনে হয় নিজেকে।
এই অপরাধবোধ নিয়ত আমাকে
কুরে কুরে খায়—
আমাকে কাঁদায়, আমাকে ভাবায়,
আমার নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার নির্বিঘ্ন শান্তিকে
কশাঘাত করে।
তাই মানুষের জন্য
একবুক উপচানো ভালবাসা নিয়ে
গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে
পথ চলি আমি, সেই দিন
যেদিন আমাদের দেশে সব ঘরে ঘরে
মায়েদের কোলে
অক্ষয় হবে শিশুর মুখের হাসি।

বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর পথে

—শাশ্বত চাট্টোপাধ্যায়

হাত ধরে চলে এসো খানিকটা পথ
যেখানে কেউ নেই,
যেখানে কিছুই নেই ;
যেখানে শুধু একটা মানুষ তার দুখানা শক্ত,
কর্মঠ হাত তুলে বলবে—সাবাশ্ !
বলবে—চলে এসো কোন ভয় নেই
বলবে – বড় ভাল লাগল তোমাদের দেখে।
তার সেই ভাল লাগাটা অনেক দামী,
একটু কষ্ট করে খানিকটা পথ যেতে হবে।
তাই বলছি—হাত ধর।
বন্ধুর সঙ্গেই বন্ধুর পথে যেতে হয়।

সূর্য এবার জয়ের ভাষণ দেবে

—শান্তনু মুখোপাধ্যায়

বিজয় কেতন এবার সবার হবে
স্বার্থ ভরা কালো মেঘের ডানা
পালক ভেঙে পড়বে পথের ধূলোয়
উড়োন চণ্ডী যাহান্নামে যাবে
সূর্য এবার জয়ের ভাষণ দেবে।

কালো মানুষ রক্ত চিনে নেবে
হিংসা দ্বেষের চেরী ফলের দানা
আছড়ে দেবে নীল সাগরের জলে
ভালবাসা ধরবে ফুলের টবে
সূর্য এবার জয়ের ভাষণ দেবে।
প্রশ্বাসেতে কীট ছড়ালো যবে
বিদ্রোহতে শুনলো নাকো মানা
জেহাদ নিয়ে তোমার উত্তরীয়
গুঁড়িয়ে দেবে নিশ্বাসেতে সবে
সূর্য এবার জয়ের ভাষণ দেবে।

দীর্ঘ সময় পার হয়েছে কবে
কলঙ্কেতে যায়নি তাতো জানা
আগুণ স্পর্শে ছোবল সর্বনাশা
বুটের ঠোকায় মৃত্যু তোমার পাবে
সূর্য এবার জয়ের ভাষণ দেবে॥

গর্ত

—দীপঙ্কর ঘোষ

গর্তের পঙ্কিল আবর্তে আমি নিমজ্জমান।
ঝপঝপ শব্দে রজ্জু উদ্ধারকার্যে
সহানুভূতিশীল।
উঠবার জন্য আমি সত্যিই আগ্রহী।
উঠতে পারব কি?
আমি ভারতবর্ষ।

আমিও এবং আমরাও.....

—পল্লব সাহা

আমি বুদ্ধ যীশু কার্ফুসিয়াসকে চিনি না,
এঁদের গভীর কণ্ঠস্বর বসন্তের বাতাসেও
আমার কানে পৌঁছয় নি,
অথচ দেখ ওরা যা খুঁজছে আমিও তাই খুঁজি,
প্রেমের সাধনায় এরা মহৎ হয়েছে, ওদের খোঁজা
বিরামহীন অনন্ত হয়ে চরম পরিণতি দেখবে বলে
আজও বেঁচে আছে আমাদেরই সাথে।
—শুধু আমাদের নামে ইতিহাস গড়ে নি,
তবু ভোরের শিশিরে আমাদের আকাঙ্খার কথা
লেখা রইল, —তৃষ্ণা নিয়ে।

এখনো রাত

—অধ্যাপক অমল চক্রবর্তী

তখনো রাত সবুজ ছিল, আকাশে নীল তারা।
আমরা কজন বিত্তভাঙা স্বপ্নদেখা লোক
আড্ডা সেরে ফিরতেছিলাম যে যার ঘেরাঘরে—
যেখানে ম্লান চন্দ্রকলার মৌন ভালবাসা
জড়িয়ে রেখে নিত্য বাড়ে অন্তহীন ক্ষয়ে।
স্বপ্ন দেখি দেখতে পারি এইটুকু অন্তত
গাধার পায়ে মলবাজানো বোঝা বওয়ার সুখে
সান্ত্বনা পাই বরফদেওয়া টাটকা মাছের মত ;
নইলে ঘোড়ার ক্ষুরের থেকে খসে-পড়া নালে
কান ঠেকিয়ে শব্দ শোনা প্রাত্যহিকের পেশা।
ফিরি, কাঁধে হাড়ের বোঝা, কুঠার নেই কোনো
হলুদ হাড়ের হিমে মলিন নত নরম খাঁচায়
ভেজা পাখির পলকা পালক ফুলিয়ে পাই ওম ;
এছাড়া আর পোশাকটোশাক লজ্জা আছে বলে
নইলে কবেই ঘোলা জলে বড়শি দিয়ে গাঁথা।

ফিরতেছিলাম, হঠাৎ গান মাঝযামিনী ফুঁড়ে
কোথার থেকে হাওয়ায় চড়ে বর্শা তুলে এলো।
অন্ধকারে পথে মড়ার গন্ধমাখা চোখে
আমরা তাকে মেপাই ভেবে পয়সা দিতে গিয়ে
হাড়ের থেকে বেরিয়ে আসা নীল বাতাসের শিসে
হারিয়ে যাই দূরে কোথায় অনন্ত শালবনে।

শিরায় গানের জেদী ঘোড়ায় সওয়ারী আর নেই
তাইতো নোনা গাছের মত জলের তৃষ্ণা নিয়ে
ফাটা জমির সামন্ত লোভ রক্ত পুঁজির লালায়
উলুধ্বনির মত গান হঠাৎ ধূসর বেজে
চেরা-পাথর ফাটিয়ে আসে অবাধ্য ঝরণায়।
এ গান কোথায় লুকিয়ে ছিল, এখন এই রাতে
প্রথম ফোটা বুকের মত অবাধ উদগমে
ফেরার পথ গন্ধ দিয়ে বন্ধ করে রাখে ;
আমরা পথে শিকড় মেলে বৃক্ষ হয়ে উঠি।

গাঢ় পুঁজের অবাধ-জমা প্রচুর প্রতিশ্রুতি
মাতিয়ে রাখে এখনো দেশ বিকল্পহীন জয়ে ;
আমরা মাতি, মত্ত হাড়ে সমর্পণের খুশী
আকাশে শুধু রৌদ্র বাড়ে খাঁ খাঁ ঘৃণা রাগে।
শব্দহীন ভালবাসার স্পর্শহীন পাপে
পুড়তে পুড়তে নদী ফুরায়, সমুদ্র যায় দূরে
বিচিত্র সংসারে স্ফীত রাষ্ট্রময়ী মেদে।
অথচ গান শ্রমে ছিল, মিলনে, চুম্বনে
ঘামের মত শরীর থেকে গানের গোপন বীজ
জন্মে জন্মে ছড়িয়েছিল আবহমান প্রাণে ;
এখন শুধু স্মৃতি শুধু স্মৃতির খোলশটুকু
আছে, বাকি সবই গেছে নিষ্ক্রিয় নিলামে।
অথচ এক ক্ষুধা মনের দুরন্ত শৃঙ্গারে
টংকারে এক গানের ঝড়ে মুক্ত হতে চায় ;

কে না জানে এখনো রাত, এখনো বাকি গান।

"ত্রি—নয়ন"

—অধ্যাপক ডক্টর দেবদাস রায়

১ সেই লোকটা

নিতান্তই একজন মামুলী লোকের গল্প শুনবে ?
লোকটা এতই মামুলী যে বাসের ভিড়ে তাকে চিনতে পারবে না।
তবু দেখ লোকটাকে নিয়ে এলাম তোমার কাছে।
তুমি লোকটাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে দেখবে ভারী বিশ্বস্ত।
তবে সাবধান! লোকটাকে কখনও প্রশ্রয় দেবে না। সারাদিন
কাজ দিয়ে রাখবে। মুটে মজুর বলে আমরা যাদের ডাকি,
লোকটা তাদের মতই খাটতে পারে নিঃশব্দে।
লোকটার একটা বড় দোষ আছে কিন্তু,
ওর একমাত্র শখ স্বপ্ন দেখা।
কি করি বলত ?
একটা মামুলী লোক স্বপ্ন দেখে, কি দেখেনা একথা
তোমাকে বলছি কেন ?
যাক, ব'লবনা।
তুমি শুধু ওকে একটু আশ্রয় দাও।
আর বাঁচার জন্য একটুকরো রুটি ছুবিন্দু ভালবাসা।

২ খোঁজ

আমার এই গল্পের নায়কের নাম অনিকেত
তার কাজ ছিল কোন কিছু না করা। কিছু না করে কতদিন চলতে পারে ?
একদিন তাই সে ঠিক করল, এবার কিছু করা যাক্।
সে ঠিক করল সূর্য্যের তাপ, সূর্য্যের আলো সব কিছু পরিমাপ করে দেখবে।
প্রথমেই সে চলে গেল মরুভূমির দেশে, সেখানে এতবেশী উত্তাপ, এত
বেশী দহন যে সে সহ্য করতে পারল না। ছেড়ে গেল সে মরুভূমির প্রান্তর।
তারপর সে ঠিক করল তুষারশৃঙ্গে যাবে। সে ঠিক পৌছল সেখানে।
সেখানে সূর্য্যের আলোর প্রতিফলন বড় বেশী। চোখ ধাঁধিয়ে যায়, সে ফিরে এল।

সেখান থেকে সমুদ্রের কাছে। সমুদ্র তাকে কাছে ডাকল। বুঝতে পারল সে সমুদ্রের যত গভীরে যে যাবে ততই আর সূর্য্যের আলো পাবে না। ঠিক করল সে সমুদ্রের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাবে অরণ্যের কাছে।

অরণ্য যেন তার অপেক্ষাতেই ছিল, সে দেখল অরণ্যের মাঝেই সূর্য্যের মৃদু উত্তাপ, জাফরানি আলো আর অপার রহস্য। সে ভাবল এদেরকে মিশিয়ে দিলে কেমন হয়? মিশিয়ে দিল সে। সে তৈরী করল এক চিরকালের সৌন্দর্য্য। এক পাগল করা স্নিগ্ধতা।

ভালবাসল সেই স্নিগ্ধতাকে। সে মরে গেল, ভুলে গেল তার নাম অনিকেত। আমার গল্প শেষ।

৩ অস্তিত্ব

জীবনকে কতভাবেই না দেখেছি আমরা।
কারুর কাছে জীবন মানেই অফুরন্ত আনন্দ।
কেই ভাবছে সময়ের নৌকায় ভেসে যাওয়াই জীবনের গতি।
আবার এমন মানুষও আছে যাদের কাছে জীবন হল স্পন্দন।
সেই স্পন্দনকে তারা ছড়িয়ে দেয় অসংখ্য মানুষের বুকে।
কিন্তু তারাই সব নয়। আছে অন্যরা
তারা বলছে জীবন হলো স্বপ্ন দেখা। তারা স্বপ্ন দেখে অনাগত
ভবিষ্যতের, যে দিন জীবন হবে সুন্দর, সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে
থাকবে ভালবাসার চিহ্ন।
এদের মাঝেই জীবন ছন্দ পায়, এগিয়ে চলে, সেই এগিয়ে
যাবার পথে কতই না কবি। বাস্তবের রূঢ়তায় স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।
চাহিদার লড়াইয়ে জীবন খোঁজে অস্তিত্ব।
এ লড়াই বাঁচার লড়াই।

শিক্ষার বিস্তার ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি

—ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী

একালের সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, সাহিত্য-শিক্ষা-চিন্তা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে আজও রবীন্দ্রনাথ খুবই প্রাসঙ্গিক। এই প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধির চমৎকার একটা ক্ষেত্র হবে সদ্য পাশ হওয়া ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি। রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার আলোকে বিচার করা যাবে জাতীয় শিক্ষানীতি বিভিন্ন দিক। যেমন 'শিক্ষার বিস্তার' প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে শিক্ষার বিস্তারের পক্ষে বলে গিয়েছেন। শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠলেই, কখনো প্রসঙ্গ টেনে এনে বারংবার বলেছেন, আধুনিক কালের নতুন শিক্ষার যে আবির্ভাব তার প্রবাহ যেন সর্বজনীন দেশের অভিমুখে বইতে থাকে; সাধারণের ঘাটে ঘাটে যেন প্রবাহিত হয় সে ধারা। মৃত্যুর এক বছর আগেও, ১৯৪০, ৬-ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে ভাষণে বলেছেন, "যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন……সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে।" "বিদ্যা মনুষ্যত্ব লাভের উপায়", "বিদ্যালাভে মানব মাত্রেরই সহজাত অধিকার।" (স্ত্রী শিক্ষা) পরাধীন দেশের শিক্ষাসংকোচের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি দাবী করেছেন, বিদ্যার প্রসারে যে প্রাচীরবাধা রয়েছে তা ভাঙতে হবে। "যেমন করিয়া হউক আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করতে হবে। …স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে।" (শিক্ষাবিধি) রাশিয়া ভ্রমণকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তি নিহিত রয়েছে প্রাচীর ভেঙ্গে সকলের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের সদিচ্ছা ও তার রূপায়ণের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। নিবিড় আবেগে রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন, "আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির (ভারতবর্ষে) সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন।"

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন অশিক্ষায় মন জড়তাপ্রাপ্ত হয়, প্রবঞ্চিত পীড়িত হয়; শিক্ষার মহাশীর্বাদ পেলে ভারতের "যুগ যুগ ধরে শৃংখলিত গণমানসের মুক্তি" ঘটবে। শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে একাধিকবার লিখেছেন,—শিক্ষা মানুষকে শক্তি দেয়, অশক্ত শক্তি লাভ করে শিক্ষার সাহায্যে। শিক্ষা মানুষকে শেখায় কিভাবে বস্তুর নিয়ম আবিষ্কার করে সে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে। শিক্ষা মানুষের মনের দাসত্ব মোচন করে। তখনই মানুষ প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারে। শিক্ষা মানুষকে পরিবারবোধ থেকে সমাজবোধ, সমাজবোধ থেকে স্বদেশবোধ এবং স্বদেশবোধ থেকে বিশ্ববোধে পরিচালিত করে। শিক্ষায় জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে। অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়। জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাযথ বিধির বিধান।

এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে, তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে—অন্য উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক হানাহানির অন্যতম কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন শিক্ষার বিস্তারের অভাবকে, অশিক্ষার আত্মগ্লানিকে,—"আজ হিন্দু মুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে; আত্মীয়কে তুলছে শত্রু করে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষে।" (শিক্ষার বিকিরণ) এই আত্মহনন নিবারণের জন্য তিনি শিক্ষাকে সর্বজনীন দেশের অভিমুখে বাহিত করতে বলেছেন।

শিক্ষার এই হিতকর বিস্তারের পথে যখনই বাধা এসেছে, রবীন্দ্রনাথ সে অপচেষ্টাকে ধিক্কার দিয়েছেন, তীব্র আক্রমন করেছেন। গোখ্‌লের সর্বজনীন শিক্ষার প্রস্তাব আক্রান্ত হতে দেখে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সরব ও তীক্ষ্ণ। (শিক্ষার বাহন)

শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার আলোকে সদ্যপাশ হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতির (National Policy on Education—1986—A Presentation) শিক্ষাবিস্তারের 'আইডিয়াটা' বিচার করা যাক। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে শিক্ষাদানের ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করার সুযোগ যখন এলো, সেদিন কংগ্রেস সরকার রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষার বিস্তারের পথে প্রাচীরবাধাটা ভাঙার কাজে সঠিক আগ্রহে হাত দিলেন না। সংবিধানে যদিও সুন্দর সংকল্প লিপিবদ্ধ হলো যে ১৯৬০ সালের মধ্যে চোদ্দ বছর পর্যন্ত সকল সন্তানকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া হবে, কিন্তু সে বড়ো আইডিয়াটা আজ পর্যন্ত ধ্যানের বস্তু হয়ে রইল। যথার্থ ইচ্ছা ও সৎ উদ্যোগের অভাবে বিদ্যার জমিতে নিরক্ষরতা আগাছার মতো বাড়তেই লাগল। নিরক্ষরতার পাপ ও লজ্জা দূরিত না হয়ে, বাড়তে বাড়তে নিরক্ষরের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৪৪ কোটি। একবিংশ শতকের আরম্ভ বছরে এই সংখ্যা পৌঁছবে ৫০ কোটিতে। এই লজ্জার ভূমিতে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির ঘোষণা হয়েছে। ৫০ কোটি নিরক্ষরের কলঙ্কের সংখ্যা-তথা দিয়েছেন স্বয়ং নতুন প্রধানমন্ত্রী—১৯৮৫ সালে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে প্রথম শিক্ষা দলিলের উদ্বোধনী ভাষণে। এই পাপ ও লজ্জা দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন, ১৯৯০ সালের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারে সর্বজনীন শিক্ষার সীমার মধ্যে দেশের সকল সন্তানকে আনা হবেই। ৪০ বছরের সুদীর্ঘ বিলম্ব সত্ত্বেও দেশবাসী উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচ মাসের মাথায় ১৯৮৬-র জানুয়ারী মাসে নতুন শিক্ষানীতির দ্বিতীয় প্রস্তাবিত দলিলে বলা হলো ১৯৯০ সালের মধ্যে সম্ভব হবে না; ১৯৯৫ সালের মধ্যে এই অবশ্য করণীয় কাজ সমাধা করা হবেই। দেশবাসী ক্ষুণ্ণ হলেন, সন্দিহান হলেন। এর তিনমাসের মাথায় জাতীয় যে শিক্ষানীতি লোক সভায় পাশ করিয়ে নেওয়া হলো সেখানে দেখা গেল সর্বজনীন শিক্ষাদানের ১৯৯৫ সালের ঘোষিত সীমাটা তুলে দেওয়া হয়েছে; কোনো নির্দিষ্ট বছরের সময়-সীমাই আর উল্লেখ করা হলো না। তবে বলা হলো, ওটা সরকারের চরম লক্ষ্য ঠিকই আছে—"eventual goal" (513)—একদিন সরকার সর্বজনীন শিক্ষা ঠিকই দেবেন।

সমস্ত ঘটনাটা জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা মনে হয়েছে ; প্রতারণার লজ্জার মতো স্বদেশবাসীকে পীড়িত করেছে এ ঘটনা।

আজ থেকে ৭১ বছর আগে মহাত্মা গোখ্‌লের সর্বজনীন শিক্ষার প্রস্তাব দেশের নেতৃত্বের হাতে প্রত্যাখ্যাত হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত ও লজ্জিত হয়ে লিখেছিলেন, "এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না।" (শিক্ষার বাহন) ৭১ বছর পর স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতিতে সে উদ্যোগে উপেক্ষা দেখে দেশবাসীর মনে সন্দেহ জাগছে—বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করতে এবং শিক্ষার ধারাকে সর্বজনমুখী করতে কেন্দ্রীয় সরকার আদৌ আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক কি না। অবশ্যই সভ্যতার দাবীমতো ভারত সরকার নীতিগতভাবে সর্বজনীন শিক্ষাকে মেনে নিয়েছেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঘোষণা করেছেন ; কিন্তু তাকে কার্যকর করতে সরকার উৎসাহী নন। এক্ষেত্রে অর্থের অভাবের কথা সরকার নানাস্থানে তুলেছেন। কিন্তু শিক্ষার দানে মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে যে অর্থ লাগবে, কষ্ট করে হলেও সে অর্থের যোগান দিতেই হবে। কারণ শিক্ষার দেশব্যাপী বর্ষণ দেশের সমিগ্রিক অগ্রগতির শিকড়ে রস জোগাবে। ভারত সরকারের এই অর্থাভাব যে নেই তার একাধিক প্রমাণ সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে। দেশের ধনী জনকে একাধিক তিনটি কর ছাড় দিয়ে (সম্পদ কর, ভূসম্পত্তি কর, আয়করের হার হ্রাস) প্রায় এক হাজার কোটি টাকা সরকার তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডার থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবছর বৃহৎ রপ্তানীকারীদের ভর্তুকি দিচ্ছেন আরেক হাজার কোটি টাকা। তৃতীয়ত উৎপাদ শুল্ক ও বহিঃ শুল্কের ক্ষেত্রে বড়ো রকমের ব্যাপক প্যাকেজ ছাড়ের ও কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় একশত কোটি টাকার রাজস্ব কম আসবে। চতুর্থত শতকরা একজনেরও কম দেশবাসীর জন্য মডেল স্কুলের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে পাঁচশ কোটি টাকা। ভারত সরকার যদি বলেন, ব্যবসায়ীদের এসব ভর্তুকি দেওয়া ও ছাড় দেওয়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য, এবং মডেল স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয়, তবে দেশবাসীর স্বতঃ জিজ্ঞাস্য—সর্বজনীন শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় অধিকতর অপরিহার্য কি না। ঐ ছাব্বিশ শত কোটি টাকার একটা অংশ বরাদ্দ হলে সর্বজনীন শিক্ষা সুনিশ্চিত করা যেতো।

ভারত সরকারের অর্থের অভাব নেই, অভাব রয়েছে সকলকে শিক্ষা দেবার দৃষ্টি ভঙ্গীরও ইচ্ছার এবং তাকে কার্যকর করার বাস্তবিক পরিকল্পনার। কেন্দ্রীয় সরকার লজ্জাজনক এই খামতি ঢাকতে সদ্য পাশ হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে বড়ো বড়ো আইডিয়ার আড়াল নিয়েছেন।

যেমন জাতীয় শিক্ষানীতিতে সরকার ঘোষণা করেছেন, 'সকলের জন্য শিক্ষা' জাতীয় লক্ষ্য—"Our national objective is that education should mean education for all" (2·3) আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের কথা বলা হলো—goals of socialism…" (2·5) কিন্তু কিভাবে ভারতের সকল ঘরে শিক্ষার ফসল উঠবে তার

বাস্তবিক ও সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা রাখা হলো না। কি উপায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে, তার পথ দেখানো হলো না। সকলকে শিক্ষাদানের ঘোষণা একটা বড়ো মাপের আইডিয়া হয়েই জাতীয় শিক্ষানীতির ভুবনে লগ্ন থাকবে। একথা বলার কারণ আইডিয়া ও তার রূপায়ণের মধ্যে পরিকল্পনাগত নিবিড় যে সম্পর্ক থাকে, এখানে তা নেই। এ বিষয় রবীন্দ্রনাথের বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তিনি মনে করতেন, "আইডিয়া যত বড়োই হউক, তহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক তাহাকে লংঘন করিলে চলিবে না।" যেখানেই লংঘন করা হয়েছে, আইডিয়া "ধ্যান করা নেশা করা মাত্র" হয়ে উঠেছে। (ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ) রবীন্দ্রনাথের এই প্রাজ্ঞ উপলব্ধির আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির 'সকলের জন্য শিক্ষার' আইডিয়া ও 'সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য' ধ্যানের বস্তুনেশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত যে নির্দিষ্ট জায়গায় হস্তক্ষেপ করে সকলের জন্য শিক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া যায় সে হলো শিক্ষাকে উৎপাদন কাঠামো, উৎপাদন পরিকল্পনা ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দিয়ে। সমাজতান্ত্রিক লক্ষের কথা সরকার বলেছেন, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশ এই উপায়েই শিক্ষাকে সর্বজনীন করেছে, শিক্ষাকে নিশ্বাস বায়ুর মতো সন্তানদের কাছে সহজলভ্য করেছে—' When the time comes for children to go to school, both boys and girls sit down at their school desks. Education is as natural to them as the air they breath " (People's well-being in Socialist Society, 1986) রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন শিক্ষার আইডিয়ার এই উপলব্ধি ও তার রূপায়ণের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। হিংস্র জার্মান নাজি-আক্রমণ চারটি বছর ধরে (১৯৪১-৪৫) সোভিয়েত শিক্ষাকে তছ্‌নছ করেছে। দেড়কোটি ছাত্রের ৮২ হাজার স্কুল ধ্বংস করেছে। ৩৩৪টি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র, অগণিত গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দিয়েছে। অগণিত শিক্ষক ও হাজার হাজার ছাত্রকে হত্যা করেছে। এই ধ্বংসমরুস্তূপ সরিয়ে দুই দশকের মাথায় ১৯৭০ সালের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সে দেশ আবার সকলকে সর্বজননীন শিক্ষার সীমার মধ্যে এনেছে, শিক্ষিতের হার ১৯৭০ সালেই তুলেছে পুরুষদের মধ্যে ৯৯৮ শতাংশে। নারীদের মধ্যে ৯৯·৭ শতাংশ (Education in the USSR 1977) এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে শিক্ষার মহৎ আইডিয়াকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো ও উৎপাদন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, আইডিয়া ও তার রূপায়ণের মধ্যে সর্বদা এই নিবিড় প্রকল্প দরকার।

কিন্তু আমাদের এই সদ্য পাশ হওয়া শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতিতে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হলো, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দূরের কথা, দেশের উৎপাদন কাঠামো ও পরিকল্পার সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করে দেবার কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হলো না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার বিচারে জাতীয় শিক্ষানীতির এরূপ অইডিয়া হলো ওপর সাজ, ওপর চাল, কথার কথা—বড়ো আইডিয়ার ধ্যান ও নেশা। স্বদেশবাসীর সঙ্গে তা ছলনার কলঙ্কজনক ঘটনায় পরিণত হতে বাধ্য।

এই কলঙ্ক দূরীকরণে কেন্দ্রীয় সরকার করণীয় কাজে হস্তক্ষেপ করে বিপরীত একটা কাজ করলেন। সর্বজনীন শিক্ষাদানের বাধার প্রাচীরটা যাতে দেশবাসীর চোখে না পড়ে, সেজন্য প্রাচীরটাকে একটা বিশাল ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ত্রিপলটা হলো প্রথাবহির্ভূত বা নন্‌ফরমাল শিক্ষার ত্রিপল। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা দেবার উদ্যোগ ও ব্যবস্থা কখনওই প্রকৃত শিক্ষার হিতকর বিস্তারের ব্যবস্থা নয়। নির্দিষ্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কোনো বিশেষ সময়ের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থা ভালো কাজ দিলেও, বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে এ বিধি কখনও দেশ ও স্বদেশবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হবে না। এ ব্যবস্থা বিদ্যালয় শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত অঙ্গনে সকল শিশুর প্রবেশের সুযোগে অসমতা সৃষ্টি করবে, বিদ্যালয় শিক্ষাকে সংকুচিত করবে। একাংশ শিশু বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ পেল, আরেক বৃহত্তর অংশের শিশু তা থেকে বঞ্চিত রইল। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে, উৎসাহমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনার সাহায্যে শিশুদের বিদ্যালয়ের দিকে টেনে আনার চেষ্টা না ক'রে তাদের ঠেলে দেওয়া হলো প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রের দিকে। এর ফলে শিক্ষা বিস্তারের প্রাচীর বাধাটা নতুন এক বিদ্বেষ বাধার রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়াবে। তাতে ক'রে স্বজাতি শিক্ষাকামী সন্তানদের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষবৃক্ষ উপ্ত হবে। পর্যাপ্ত বিদ্যালয় খুলে, সঠিক পরিকল্পনা ক'রে সকলকে প্রকৃত স্কুল শিক্ষা দেবো না বলেই যদি এই সব পরিকল্পনা হয়ে থাকে, তবে বলতেই হবে সেই অন্যায় অনিচ্ছাই ধরা পড়েছে প্রথাবহিভূত শিক্ষাপ্রণালীর ঘোষণায়। রবীন্দ্রনাথ এরূপ অনিচ্ছার মূল খুঁজতে গিয়ে জার শাসিত রাশিয়ার শিক্ষানীতি সম্পর্কে টলস্টয় যা বলেছেন তাকে সমর্থন করে বলেছেন,—সরকার জনগণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার চায় না, কারণ জনগণের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার মধ্যে সরকারের শক্তি নিহিত—"The strength of the Government lies in the people's ignorance and the Government knows this and will therefore always oppose true enlightenment," (শিক্ষা সংস্কার) রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিতে জাতীয় শিক্ষানীতি বিচার করলে মনে হবেই যে কেন্দ্রীয় সরকার চাইছেন দেশের জনগণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার না ঘটুক। দলমত নির্বিশেষে সন্তানহিতাকাঙ্ক্ষী স্বদেশবাসী অভিভাবক ও আত্মহিতকামী সন্তানমাত্রেই এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগবোধ করবেন।

আমরা নতুন এক জাতীয় শিক্ষানীতি পেলাম। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্তানরা প্রকৃত শিক্ষার সহজাত অধিকার থেকে, মনুষ্যত্ব লাভের উপায় থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেল।

ভারতবর্ষ জাতীয় শিক্ষানীতি পেল, কিন্তু আর্যসভ্যতার এই প্রাচীন ভূমি ভারতবর্ষের সব মানুষ শিক্ষার মহাশীর্বাদ লাভের পথ পেল না। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিশ্লেষণে রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা এই ক্ষোভ ও বেদনার উপলব্ধিতে পৌঁছে দেবে।

মে দিবসের ইতিহাস ও বর্তমান তাৎপর্য

—বীণাঞ্জনা সেন

প্রত্যেক বছর পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণী পয়লা মে তারিখটি শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংহতির প্রতীক দিবসরূপে উদ্‌যাপন করে থাকেন। সমগ্র মানব জাতির জন্য স্থায়ী শান্তি, গণতন্ত্র ও সুখী ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করার ঐতিহাসিক কর্তব্য, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণী এই দিনে নতুনভাবে স্মরণ করেন; এই মহান কর্তব্য সফল করতে আন্তর্জাতিক সংহতি ও সহযোগিতার সঙ্কল্প নেন।

মে দিবসের জন্মকাহিনী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে কাজের সময় কমাবার আন্দোলনের সঙ্গে। আধুনিক শিল্পের জন্মক্ষণ থেকেই মার্কিন দেশের শ্রমিকরা কারখানায় কাজের সময় কমাবার দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা উদয়-অস্ত কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। আন্দোলনের একটি পর্যায়ে ১৮৬৬ সালে "ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন," একটি শ্রমিক সঙ্ঘ দিনে আটঘণ্টা কাজের দাবীর আইনী স্বীকৃতির জন্য সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ বছরই, ইউরোপে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে ন্যাশানাল লেবার ইউনিয়নের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং এই দাবীকে সারা পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ দাবী হিসাবে গ্রহণ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে কারখানায় কম সময় কাজের দাবী নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে।

১৮৬৬ সালে যে আন্দোলনের সূচনা সে আন্দোলন নানা পর্যায় অতিক্রম করে ৮৬ সালের মে দিবসে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ১৮৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গভীর মন্দা শুরু হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি থেকে এক অভূতপূর্ব সংগ্রামী চেতনার জন্ম। ৮০র দশকে প্রথম পাঁচ বছরে ধর্মঘটের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পায় আর অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় চারগুণেরও বেশী।

সেকালে বামপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল শিকাগো। স্বভাবত এই শিকাগোতেই ১লা মে-র ধর্মঘট খুব জঙ্গীরূপ ধারণ করে। ধর্মঘটের প্রস্তুতির জন্য সেখানে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি মিলিতভাবে একটি আট-ঘণ্টা-শ্রম-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করে। ১লা মে'র ঠিক আগের রবিবারে "সেণ্ট্রাল লেবার ইউনিয়ন" একটি সমাবেশ সংগঠিত করে ২৫০০ শ্রমিক এই জমায়েতে অংশগ্রহণ করেন। শহরের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ডাকে এই সমস্ত শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে আসেন রাজপথে। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই প্রথম সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত পদক্ষেপ; এর আগে শ্রেণী সংহতির এত বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায়নি। শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুরাও সে সময় নিষ্ক্রিয় ছিল না। মালিক এবং শিকাগো সরকারের শক্তি সম্মিলিত হয়ে, সুসজ্জিত সামরিক শক্তির জোরে রোধ করে শ্রমিক অভিযানের

দুর্দম গতি। ১লা মে তারিখের এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হল ৩রা ও ৪ঠা মে তারিখের ঘটনা সমূহ—যা সাধারণভাবে "হে মার্কেটের" ঘটনা বলে পরিচিত। ৩রা মে তারিখে "মাক-কর্মিক রীপার কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশের পাশবিক আক্রমণের ফলে ছয় জন নিহীত হয় আর তার সাথে আহত হয় বহু শ্রমিক। পুলিশের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ৪ঠা মে "হে মার্কেট স্কোয়ারে" একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা চলছিল শান্তিপূর্ণ ভাবে এমন সময় পুলিশ আবার আক্রমণ করে। ভীড়ের মধ্যে একটি বোমা এসে পড়ে এবং এর ফলে মৃত্যু হয় এক সার্জেন্টের। সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় লড়াই যে লড়াইয়ে প্রাণহানি হয় সাতজন পুলিশের ও চারজন শ্রমিকের। কিন্তু এইখানেই ঘটনা থেমে থাকে না—মালিক পক্ষ এর জবাব দেয় নেতাদের নির্বিচারে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ নিয়ে ও অসংখ্য শ্রমিককে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

শিকাগোতে এই ঘটনার এক বছর পরে ১৮৮৮ সালে বর্তমান আমেরিকায় "ফেডারেশন অব লেবার" বলে যা পরিচিত সেই "ফেডারেশন" সেন্ট লুই সম্মেলনে আট ঘণ্টা কাজের আন্দোলন আবার শুরু ও সংগঠিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১লা মে তারিখটিকেই পুনরায় বেছে নেওয়া হল এই আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের দিন হিসাবে। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের, প্যারিস কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা আমেরিকার শ্রমিকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোষণা করে যে সমস্ত দেশে আট ঘণ্টা কাজের সময়ের আইনী স্বীকৃতির জন্য "আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের" সিদ্ধান্ত মত ১৮৯০ সালের ১লা মে তারিখে আন্তর্জাতিক স্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। সেই বছর থেকে মে দিবসের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বাড়তে থাকে। আরও নির্দিষ্ট এবং বিস্তৃত আকার ধারণ করতে থাকে মে দিবসের দাবী। আট ঘণ্টা কাজের দিনের মূল দাবীর সঙ্গে যুক্ত হয় আরো সব তাৎপর্যপূর্ণ দাবী যেমন সার্বজনীন ভোটের অধিকার; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরোধিতা; মিছিলের অধিকার, রাজবন্দীদের মুক্তি; শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সংগঠন গড়বার অধিকার প্রভৃতি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পুঁজির বিকাশ ও কেন্দ্রিকরণের ফলে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলি পুঁজি ও পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য অনুন্নত দেশগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করে। নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত হয়—প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। উপনিবেশ থেকে লুট করা অর্থের ভাগ সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংগঠিত শ্রমিকদের কিছু অংশে দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে শ্রমিক সঙ্ঘের সংগ্রামী চেতনার অবনতি ঘটে। দেখা দেয় সংস্কারবাদ, সংশোধন বাদ—যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সোশাল ডেমোক্রাট দলগুলি সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে মে দিবসের সংগ্রামী চরিত্রকে হনন করার চেষ্টা করে। উদাহরণ হিসাবে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের' প্রচেষ্টার উল্লেখ করা যেতে পারে; এই ফেডারেশন মে দিবসের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী ঐতিহ্যের পাল্টা প্রতিষেধক হিসাবে কেবলমাত্র

সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবারটিকে "শ্রমিক দিবস" হিসাবে পালন করার প্ররোচনা দিতে থাকে। প্রথমে এই দিনটা ঠিক করা হয়েছিল ১৮৮৫ সালে নেহাতই স্থানীয় ভাবে উদ্‌যাপনের জন্য। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যসরকারগুলিও ঐ দিবসটিকে স্বীকৃতি দান করে মে দিবসের অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতিষেধক হিসাবে। হুভারের আমলে মে দিবসের তাৎপর্যকে ম্রিয়মান করার জন্য আরো একটি পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়া হয়—১লা মে'কে শিশু স্বাস্থ্য দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। এটাও করা হয়—"আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের" সহায়তায়। শিশু কল্যাণ সম্পর্কে হঠাৎ এত আগ্রহ প্রকাশের প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় উক্ত ফেডারেশনের ১৯২৮ সালের সম্মেলনে তার কার্যকরী পরিষদ যে বিবরণী উপস্থাপিত করে তার থেকে বিবরণীতে বলা হয়—"কমিউনিষ্টরা এখনও ১লা মে'কে শ্রমিক দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করে। এরপর থেকে ১লা মে পরিচিত হবে শিশু স্বাস্থ্য দিবস হিসাবে, ... উদ্দেশ্য সারা বছর ধরে শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার সপক্ষে মনোভাব তৈরী করা। উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। আরও উল্লেখযোগ্য যে এখন থেকে মে দিবস আর ধর্মঘট দিবস "বা কমিউনিষ্ট দিবস হিসাবে পরিচিত হবে না।"

শুধু মাত্র অর্থ নৈতিক দাবী দাওয়ার জন্য সংগ্রাম কখনই সাফল্য লাভ করতে পারে না—এই চেতনা মার্কস, এঙ্গেল্‌স বিভিন্ন সময়ে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এবং এর সাথে সঙ্গতি রেখেই ১৮৯৩ সালে আন্তর্জাতিকের জুরিখ কংগ্রেসে এঙ্গেল্‌সের উপস্থিতিতে যে প্রস্তাব নেওয়া হয় তা শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়, মে দিবস দেখা দেয় একটা সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্য নিয়ে, দেখা দেয় সমাজ পরিবর্তনের এক বৈপ্লবিক হাতিয়ার হিসাবে। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ "শুধু আট ঘন্টা কাজের দিনের জন্যই মে দিবসের সমাবেশ নয়, সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণী বৈষম্যকে ধ্বংস করার জন্য তাকে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় সংকল্পের সমাবেশে পরিণত করতে হবে এবং এভাবেই যেতে হবে সেই পথে যেটা সকল জাতির শান্তির পথে, বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ।

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক সংগ্রামকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান লেনিন। লেনিন তাঁর 'What Is To Be Done'এ এই সমস্যার বিশ্লেষণ করে বলেন যে শ্রমিক সঙ্ঘের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সমাজ তাত্ত্বিক চেতনা জন্মায় না। পার্টির দায়িত্ব শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অবলুপ্তির ফলে বিশুদ্ধ শ্রমিক সঙ্ঘ চেতনার সংশোধনবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রায় মৃত। মে দিবসের সংগ্রামী তাৎপর্য হারিয়ে গেছে। তাই মে দিবস উদ্‌যাপন শুধু শ্রমিক সংঘের সংগ্রাম স্মরণে সীমিত রাখলে চলবে না। ১লা মে শ্রমিক সংঘ এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয় সংশোধনবাদ ও সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে চিরন্তন সংগ্রামের গূঢ় তাৎপর্য॥

বাবু

অরূপ পাল

ছাত্র শিক্ষককে বলিল, "স্যার শুনিয়াছি কলিযুগে নাকি বাবু নামে একপ্রকার মনুষ্যজাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে, ইহারা পৃথিবীতে জন্মাইয়া কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং কি কি কার্য করিবেন তাহা দয়া করিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করুন।"

শিক্ষক কহিলেন, "ঠিক আছে বৎস, তুমি শোনো, আমি বর্ণনা করিতেছি।

আমার বর্ণিত বাবু শহরে পথে ঘাটে, অফিস কাছারিতে আদালতে থিয়েটার আসরে সর্বত্র দেখিতে পাইবে। এই বাবুগণ দুই-হাত, দুই-পা বিশিষ্ট এক প্রকার মনুষ্য হইবেন। পরিচ্ছদে সুটেড বুটেড এবং কথায় তাহারা সাহেবীআনার পারদর্শিতা দেখাইবেন। তাহাদের ভিতর থাকিবে শূন্য কিন্তু বাহিরে তাহারা মিথ্যা ব্যক্তিত্বকে জাহির করিবেন। কথায় তাহাদের মিষ্টতা কিন্তু অন্তরে পরম শত্রুতা বিচরণ করিবে। তাহারা পরের সুখ দেখিলে ঈর্ষা করিবেন, পরের ভালবাসায় আঘাত করিবেন এবং পরের শান্তি বিনষ্ট করিবেন। তাহাদের বাবুআনায় ধর্ম হইল ছয়কে নয় এবং নয়কে ছয় করা। তাহারা পরের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইবেন, পরের সমলোচনা করিবেন কিন্তু তাহার প্রশংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন।

প্রিয় ছাত্র আমার, এই বাবুগণের জীবনস্তর বিভিন্নরকম হইবে। শৈশবে মাতার কোলে স্তনপান করিবেন কৈশরে পিতার অধীনে রইবেন যৌবনে স্ত্রীর ঝাঁটা খাইবেন এবং বাবু নামে পরিচিত হইবেন এবং বার্ধক্যে পুত্রের লাঞ্ছনা সহ্য করিবেন। এই বাবুগণকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে দেখিবে। চায়ের দোকানে পাড়ার সংবাদ আলোচনায়, রকে সিগারেট হস্তে রাজনৈতিক আলোচনায় কিংবা সিনেমা হলে নারী প্রসঙ্গ আলোচনায়। ইহাদের কথাবার্তা, রুচিবোধ, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য সব আলাদা হইবে। ইহারা গৃহে পিতার নিকট গালি খাইবেন, প্রিয়তমার নিকট ধাপ্পড় খাইবেন, মাষ্টারের নিকট বেত খাইবেন, বান্ধবীর নিকট কানমলা খাইবেন, বন্ধুর সহিত মদ খাইবেন, বাসের কণ্ডাকটরের জুতা খাইবেন, বাড়ীওয়ালার গলাধাক্কা খাইবেন, পাড়ার ছেলেদের দুর্গাপূজার চাঁদা না দেওয়ায় শাসানি খাইবেন এবং অবশেষে বাবু নামে পরিচিত হইবেন।

পুনরায় শোনো, ভগবান যেইরূপ পঞ্চভূতে বিরাজমান ইহারাও সেইরূপ সর্বত্র বিরাজ করিবেন। পাড়ার লোকের নিকট দাদা হিসাবে, অফিসে BOSS হিসাবে, স্কুলে কলেজে সবজান্তা হিসাবে, প্রিয়তমার নিকট পরম প্রেমিক হিসাবে এবং সংসারে কলঙ্ক হিসাবে পরিচিত হইবেন। ইহারা কম কাজ করিবেন, বাচালতা বেশী প্রকাশ করিবেন, সর্বদা সৌখিন ভদ্রতা প্রকাশ করিবেন, কেবল নিজের আভিজাত্যকে জাহির করিবেন।

যাহারা পিতার নিকট নেশা করিবেন, নারী দেখিলে প্রেমপত্র নিবেদন করিবেন, ব্যর্থ প্রেমের জন্য আস্ফালন করিবেন, অতিথি দেখিলে খাতির করিবেন, তাহারাই বাবু। যাহারা ছাত্রজীবনে স্কুল পালাইয়া মেট্রোর সামনে যাইবে, যৌবনে অফিস পালাইয়া ইডেন বা ভিক্টোরিয়ায় যাইবে এবং মধ্য বয়সে ঘরে বসিয়া স্ত্রীর সহিত লুডো খেলিবে তাহারাই বাবু হইবেন। ইহারা অমিতাভ, রাজেশ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিবেন এবং এবং জয়া, মিনাক্ষীর গৃহে রাত কাটাইবেন, কাজ না থাকিলে মাছি মারিবেন।

ইহারা সকলের নিকট বাবু। যেমন ভৃত্যের নিকট তাহার মনিব বাবু, কর্মচারীর নিকট তাহার মালিক বাবু, জনসাধারণের নিকট দেশনেতা বাবু, সিনেমাহলের ব্ল্যাকারের নিকট পুলিশ বাবু, ডাবওয়ালা বা চালওয়ালার নিকট টিকিট চেকার বাবু।

সবশেষে আর একটা নূতন গুন বাবুদের মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহা বলি। ইহারা বিবাহকালে কন্যাপক্ষের নিকট বিনয় দেখাইবে অথচ যথাসম্ভব পণ আদায় করিবে। কার্যসিদ্ধি না হইলে লক্ষ্যবস্তুটিকে দগ্ধ করিবে।"

ছাত্র কহিল, "বাঃ স্যার! বাবু সম্পর্কে অনেক কিছু জানিলাম। আজ চলি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু'
বৃত্তান্ত অন্তকরণে

প্রবন্ধ

পকেট কাটা হাত গুঁড়াও

—গণদেব চক্রবর্ত্তী

বিশ্ববিখ্যাত জনদরদী সাহিত্যিক রোমারোঁলা এ বিষয়ে ধণকুবের মার্কিন মুলুক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন—'নিকারাগুয়ার পকেট কাটছে আমেরিকা।'

একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর আর একদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, এরই মধ্যে মধ্য আমেরিকার ক্ষুদ্র অনুন্নত দেশটি নিকারাগুয়া। গত দেড়শ বছর ধরে এই চোট্ট দেশটির উপর চলেছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শোষণ। তার ফল হিসাবে নিকারাগুয়া আজ বিকলাঙ্গের রূপ ধারণ করেছে। সমুদ্রের শান্ত পরিবেশে লালিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় নিকারাগুয়ার পকেট কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ শক্তি ধারালো কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে তা রোমারোঁলা সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন। আজ এত বছর পরেও ক্রান্তিদর্শী সেই ব্যক্তির উপলব্ধির সততা সর্বগ্রহণযোগ্য হয়েছে।

এই পকেট কাটার দল প্রথম ১৮২১ সালে নিকারাগুয়ায় প্রবেশ করে, এবং তারপর গত দেড়শ বছর ধরে সৃষ্টি করেছে সেখানে এক কলঙ্কিত রক্তাক্ত ইতিহাস। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার

অন্যান্য দেশের মত নিকারাগুয়াও ছিল বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির লগ্নী ও লুণ্ঠনের রাজত্ব। মার্কিন মুলুক যে কট দেশের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পনীগুলির শোষণের জাল বিস্তার করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম নিকারাগুয়া। এখানকার অর্থনীতিও সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই রূপে। নয়া উপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমেরিকার সাহায্যের নামে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী বাণিজ্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছিল। চাষের জমির উপর একাধিপত্য বিস্তার করে সেখানে কেবল আমেরিকার রপ্তানিযোগ্য ফসলই ফলানো হত। এই ভাবে মার্কিনরা ধীরে ধীরে নিকারাগুয়ার পকেট কেটে ফেলতে লাগল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাদের মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে এই ঘৃণ্য ঘটনাগুলি ঘটিয়ে চলেছিল। এদের মধ্যে উইলিয়াম ওয়াকার, এ্যাডলফো দিয়াজ এবং সোমাজো গার্সিয়া উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে সোমাজো গার্সিয়ার আমলে নিকারাগুয়ার সাধারণ মানুষ সম্মুখীন হয়েছিল চরম দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ও অবক্ষয়ের। মানুষ হয়েও মানুষের মর্যাদা তারা পায় নি। দাস প্রথা চালু করে মানুষকে ব্যবহার করা হয়েছে জন্তু জানোয়ারের মত। অস্ত্রের ঝংকারে মানুষ হয়েছে শঙ্কিত। নিরন্ন কৃষক, তরুণী শ্রমিক ও শিশুদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ছিল সে সময়ের ধারাবাহিক নিত্যকার্য।

কিন্তু নিকারাগুয়ার ইতিহাস শুধু উৎপীড়ন বা নির্যাতনের ইতিহাসই নয়, বিদ্রোহের ইতিহাসও তারা তৈরী করেছেন। তৈরী করেছেন বিপ্লবের পথ। তারা বলেছেন 'বিপ্লব আমাদের প্রাণ—তা বাঁচাবোই।' এই বিষয়ে এক অখ্যাত চাষী পরিবারের ছেলে সানদিনিস্তার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম ১৭ জন শোষিত শ্রমিক নিয়ে এক গেরিলা বাহিনী তৈরী করে টানা সাত বছর মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। তাঁর যুদ্ধের ইতিহাস নিকারাগুয়ার বিপ্লবের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এই মুক্তিযোদ্ধাকে তৎকালীন সোমাজো সরকার বেশীদিন বেঁচে থাকতে দেয় নি। চক্রান্ত করে তাকে হত্যা করা হয়। সেদিন কিন্তু মার্কীন প্রশাসনের মুখোশটাকে নিকারাগুয়াবাসী চিনে নিতে ভুল করেনি। তারপরই গঠিত হয়েছিল সানদিনিস্তা মুক্তিফ্রন্ট। এই মুক্তিফ্রন্টের সংগ্রামী মনোভাব, সংগঠন করার ক্ষমতা এবং অদম্য সাহস নিকারাগুয়ার সমস্ত মানুষকে টেনে এনেছিল এই ফ্রন্টের মধ্যে এবং এই ফ্রন্টের নেতৃত্বে সমগ্র নিকারাগুয়াবাসীর অক্লান্ত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭৯ সালের ২১শে মে। ঐ দিন সানদিনিস্তা ফ্রন্টের যোদ্ধারা সাম্রাজবাদ শক্তিকে পরাস্ত করে নিকারাগুয়াকে স্বাধীন হিসাবে ঘোষণা করেন।

স্বাধীন হিসাবে নিকারাগুয়া মূলতঃ ভৌগলিক। ছোট্ট দুর্বল দেশটির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিন্তু এখনও পকেট কাটাদের কুক্ষিগত। স্বাধীন হয়েও নিকারাগুয়াকে সহ্য করতে হচ্ছে অর্থনৈতিক উৎপীড়ন। সাম্রাজ্যবাদের এই নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯৮৩ সালে 'কন্টাডোরা' প্রস্তাব নামে এক সর্বজনবিদিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং এই প্রস্তাবে বলা হয় যে সব দেশ থেকে বিদেশী সমর বিশারদদের চলে যেতে হবে, অন্য দেশের ওপর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে কেউ উৎসাহ দেবে না।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এই প্রস্তাব মেনে নিলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের আবেদনের কোন মূল্যই নেই রেগনসাহীর কাছে। উপরন্তু ১৯৮৫ সালে রেগন প্রশাসনের নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধ ঘোষণা এই দেশকে আরও কোণঠাসা করে দিয়েছে। তাই আজ নিকারাগুয়া বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে সাহায্যের জন্য ঘুরে ফিরছে।

পকেট কাটার দল সারা পৃথিবীব্যাপী তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট। প্যান আমেরিকার ছোট্ট দেশ চিলি। পকেট কাটার দল নির্বাচিত আলেন্দে সরকারকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে আর গুলি বারুদের মুখে উড়িয়ে দিল। তামার খনিগুলোতে অর্থগৃধ্নু মার্কিনী মালিকানা কায়েম করল। কলের দম দেওয়া পুতুলের মতো হুকুম তামিল করে চলেছে আজও পিনোচেত সামরিক সরকার। এল সালভাদোর, হণ্ডুরাস, ফিলিপাইন, গ্রানাদা সর্বত্র পকেট কাটার দল কাচি চালাচ্ছে। রক্ত ঢালছে ছাত্র, যুব, দেশপ্রেমিক মানুষ। এক আওয়াজ তুলছে 'পকেট কাটার দল হাত ওঠাও'।

পকেট কাটা দলের শ্যেনদৃষ্টি ভারত উপমহাদেশেও পড়েছে। ভারত মহাসাগরে নৌবহর টহল দিচ্ছে, দিয়াগো গার্সিয়ায় ঘাঁটি গেড়েছে, শ্রীলঙ্কায় তামিল নিধনে জয়বর্ধন সরকারকে উৎসাহিত করেছে, পাকিস্তানকে সমর সজ্জায় সজ্জিত ক'রে ভারতের উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। এর সাথে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ঋণের টোপ গিলিয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম যুগে P.L-84 এর টোপ গিলিয়েছিল। একই সঙ্গে ভারতের মাটিকে-ও করে তুলছে অশান্ত। কোথাও খালিস্থানের, কোথাও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, কোথাও অর্থ নৈতিক দাবীদাওয়ার শ্লোগান তুলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে ভারতকে। এর সঙ্গে প্রতি দেশের মতো দেশীয় সারমেয়ের দল পকেটকাটার দলের সাকরেদ জুটেছে। তাই আজ পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছে, আসাম জ্বলছে, জ্বলছে গুজরাট, সমগ্র ভারতের সংহতি আজ বিপন্ন। এর জন্য দায়ী ঐ পকেট কাটার দল। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে একটা একটা করে সুতো তারা ছিঁড়ে ফেলছে। পাঞ্জাব, আসাম অতিক্রম করে পকেট কাটার দল এখন বাংলার মাটিতে পা রেখেছে। আমার বাংলার পকেট ওরা কেটে নিতে চাইছে। আমার বাংলা মায়ের অঙ্গচ্ছেদ করতে চাইছে ওরা। যে বাংলা সারা ভারতের ঐতিহ্য, যে বাংলার মাটি বিপ্লবের রক্তে উর্বর, সারা ভারতের গর্ব, যে বাংলার মানুষ চিরন্তন সংগ্রামের প্রতীক আজ সেই বাংলার মুণ্ডুচ্ছেদ করতে চাইছে ঐ পকেট কাটার দল।

তবে পকেটমার ধরা পড়লে জনরোষে তার হাল বেহাল হয়ে যায়। পকেট কাটার দল সে শিক্ষা পেয়েছে ভিয়েতনামে, কিউবায়। আজ পকেট কাটার দলকে ধরতে হবে, জনরোষে ফুঁসে উঠতে হবে, দেশপ্রেমিক লড়াই করতে হবে এই পকেট কাটার দলের বিরুদ্ধে। আওয়াজ হবে— "পকেটকাটার দল অন্য দেশ থেকে হাত ওঠাও"।

নজরুল—প্রিয় বুলবুল

অধ্যাপক স্বপন কুমার দাস

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে ও প্রাঙ্গণে পাখীদের ওড়াউড়ি বহুকালের। নিসর্গদৃশ্যের অন্যতম উপাদান পাখী বিভিন্নভাবে উপস্থিত হয়েছে কবি-কথাশিল্পীদের কলমের আঁচড়ে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল থেকে হাল আমলের জীবনানন্দ বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কেউই মুক্তপক্ষের বিহঙ্গের সচ্ছন্দ আকাশবিহার বা কুঞ্জবনে প্রাণ আকুল করা সুরেলা শিসের আকর্ষণ এড়িয়ে যেতে পারেন নি। তবে এ ব্যাপারেও তাঁদের কিছুটা পক্ষপাতিত্ব লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের একটু বেশী পচ্ছন্দের পাখী ময়ূর, আরও স্পষ্টভাবে শিখীদম্পতি, নজরুলের ঠিক তেমনি বুলবুলের উপর টান যেন একটু বেশী। অবশ্য অন্য পাখীও তাঁর কবিতা-গানে একেবারে অনুপস্থিত থাকে নি। এখানে একটা উল্লেখ করার করার মতো বিষয় হ'ল রবীন্দ্রনাথের রচনাসম্ভার বুলবুল যেন কিছুটা ব্রাত্য থেকে গেছে।

কালো রংয়ের ছোট এই গায়ক পাখীটিকে আমাদের ঘরের আনাচে-কানাছে প্রায়ই দেখা যায়। এর পিঠের দিক ঘোর বাদামী আর কালো মেশানো, কিন্তু পেটের দিক সাদা। মাথার উপরে একটি ছোট ঝুঁটি আছে। উত্তেজিত হবেন ঝুঁটি তিরতির করে নড়ে। দেহের মধ্যে বেশ একটা ছিমছাম ভাব আছে। লেজ মাঝারি আর লেজের প্রান্ত চৌকোনা, তলার দিকে লেজের গোড়ায় একগুচ্ছ রক্তলাল পালক থাকে।

বুলবুল সাধারণত দু'ধরণের হয়—অন্তত আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। সাধারণ বা কালো বুলবুল এবং সিপাহী বুলবুল আর আছে কুনগোল ও হিমালয়ের পাহাড়ী বুলবুল। প্রথমটির গালে দুটি সাদা রংয়ের পালকগুচ্ছ আছে ব'লে এ নাম। পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে অবশ্য এই দুই জাতের বুলবুল কমই দেখা যায়।

বুলবুল মানুষের সঙ্গপ্রিয়। স্বভাব-চঞ্চল এই পাখী থাকে জোড়ায় জোড়ায়। গাছে এরা যত স্বচ্ছন্দ, মাটিতে তত নয়। তাই গাছ থেকে গাছে সমর্থ পক্ষবিস্তারে পরিভ্রমণরত অবস্থায় এদের দেখা মেলে বেশী। ঝোপঝাড় কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে বুলবুল খোঁজে তার আহার্য—ফল-পাকুড়, ফুলের মকরন্দ আর কীটপতঙ্গ।

বুলবুল কিন্তু শান্তিপ্রিয় মোটেই নয়, বরং একটি সক্ষম-সমর্থ পুরুষ অপর পুরুষ পাখীকে বিশেষ সহ্য করে না—লড়াই বাঁধায়। কিছুদিন আগেও এই কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের, আরও সঠিকভাবে তথাকথিত "বাবু কালচারের" অংশীদারদের মধ্যে বুলবুলের লড়াই অনুষ্ঠিত হত। বিশেষ এই সম্প্রদায়ের মন্দাক্রান্তা ছন্দের জীবনযাত্রায় পাখীর লড়াই কিছু উত্তেজনার খোরাক জোগাত। সিপাহী বুলবুলের চেহারাটিও এর নামটিকে অর্থবহ করেছে। মাথায় জবরদস্ত ঝুঁটি আর সাদা গালে, চোখের ঠিক নিচে ঘোর লাল গাল চাপ্টা। পাঁড় সিপাহী যেন যুদ্ধের জন্য একেবারে তৈরী।

বুলবুল বৈশাখ থেকে ভাদ্র অবধি ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে। শুকনো ঝরাপাতা, গাছের সরু নরম ডাল আর শিকড়-বাকড়ের মতো বিচিত্র সব সম্ভারে নীড় বাঁধে এবং গৃহস্থালী সাজায় সাধারণত বছরে দুবার এরা ডিম পাড়ে, তবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসই এদের বেশী পচ্ছন্দ। এক এক-বারে এরা দুটি থেকে চারটি নতুন প্রাণকে পৃথিবীর আলোয় নিয়ে আসে। ঘোরতর সংসারী বুলবুল বাবা-মা মিলেমিশে সন্তানের যত্নআত্মি করে।

বুলবুলের চরিত্রে যেন কিছুটা স্বভাববৈপরীত্য আছে। এমনিতে শান্ত মেজাজের না হলেও এর সুমধুর শিষ কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌছায়। পক্ষী বিশেষজ্ঞ শ্রীঅজয় হোমের মতে বুল-বুলের ডাককে ঠিক গানের পদবাচ্য করা উচিত নয়। এর গলার আওয়াজটি মিষ্টি এবং এক, দুই বা খুব বেশী হলে তিন স্বরগ্রামের। তবে কবি শিল্পীর সংবেদনশীল মনে বুলবুলের শ্রুতি মধুর শিস যদি সংগীতের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, তাহলে তাতে তাঁদের মনের পেলব গঠনটিই ধরা পড়ে।

নজরুলের বুলবুল প্রীতির প্রসঙ্গে যাবার আগে আর একটি বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন আছে। পারস্যদেশীয় কাব্য সঙ্গীতে গোলাপের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হিসাবে যে "বুলবুল-এ-বস্তা"— উল্লেখ পাই, সেটি জাতে ভিন্ন। পক্ষীতত্ত্বের নিরীখে সেটি নাইটিঙ্গেল জাতীয় এবং নির্ভেজাল গাইয়ে খুব সম্ভব পারস্যের এই বিশেষ জাতের বুলবুলই নজরুলের রচনাসম্ভারে ছায়া ফেলেছে।

বুলবুলের জাতপাঁত বিচার এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। পক্ষীতত্ত্বের মতো গুরুগম্ভীর ব্যাপারে না গিয়ে দেখা যাক এ পাখীটি নজরুলের রচনায় কি কি নান্দনিক ইঙ্গিত বহন করছে। পরিসর অল্প সেইজন্য বর্তমান আলোচনাটি নজরুলের গানের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বুলবুল নজরুলের গানে যুগপত দুঃখ-বেদনার বিষন্ন প্রহরে এবং হাসি-আনন্দের উৎসবে প্রধানত গজল গায়ক হিসাবে হাজির ঃ

"হে মদিনার বুলবুলি গো
গাইলে তুমি কোন গজল।"

এ গজল গান কখনও প্রেমের উচ্ছাসকেই মূর্ত করেছে আর কবি নিজে বুলবুলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এই পাখীর শিসের সুর বাহারে তার মন আপ্লুত। যেমন করে পুরুষ বুলবুল তার সঙ্গিনীকে সুরের মায়াজালে ধরে রাখে সে সম্মোহক রূপটি ধরা পড়েছে বিদ্রোহী অথচ প্রেমিক কবির গানে। নজরুল এবং বুলবুলের চরিত্রগত মিলটুকু নজর কাড়ার মতো ঃ

গুল বাগিচার বুলবুলি আমি রঙীন প্রেমের গাই গজল
অনুরাগের লাল শরার মোর চক্ষে ঝলে ঝলমল (হায়)॥"

কবি মাত্রেরই বিষণ্ণতা এবং গভীর গোপন দুঃখ সর্বক্ষণের সাথী। তাত্ত্বিকেরাও একই সুর বলেন যে সমস্ত সার্থক এবং কালোত্তর সৃষ্টির পিছনে এ বেদনা প্রেরণা যোগায়। মানুষের মনের গঠনই বোধ হয় এ রকম। আমরা সুখকে বাইরের ঘরেই রাখতে ভালোবাসি এবং আনন্দের ভাগ আত্মীয়

পরিজনদের দিয়ে প্রীত হই। দুঃখ বেদনার ঠাঁই বুঝি অন্তরের অন্দরমহলে। বিরহ বেদনার ক্ষণটিতেই নজরুল তাঁর প্রিয় পাখী বুলবুলকে এনেছেন—সে এসেছে অবশ্য ক্ষণিক সুখের পূর্বস্মৃতিচারণায়:

"বিরহের গুলবাগে মোর ভুল ক'রে আজ
ফুটলো কি বকুল।
অবেলার কুঞ্জবীথি মুঞ্জরিতে
এলে কি বুলবুল॥"

বিদগ্ধজনেরা জানেন, নজরুলের রচনায় পারস্য কাব্য গাথার প্রভাব সুস্পষ্ট। নয়নভিরাম গঠন বৈচিত্র এবং সুমিষ্ট গন্ধবাহী গোলাপ পারস্যের উষরভুম থেকে মোগল বাদশার বদান্যতার সূত্রে এ দেশে পৌঁছায়—এও এক ঐতিহাসিক সত্য। গোলাপের সঙ্গে বুলবুলের সখ্যতা নিবিড়, অন্তত সাহিত্যের অঙ্গনে। নজরুল এ ছবিকেও ধরেছেন তাঁর গানের ফ্রেমে:

"ইরানের বুলবুলি কি এলে
গোলাপের স্বপ্ন লয়ে সিন্ধুনদীকূলে।"

প্রিয় বান্ধব গোলাপের বেদনাও বুলবুলকে স্পর্শ করে, সেও বুঝি বন্ধুর হৃদয়ভার লাঘবে আগ্রহী:

"বুলবুলির নীরব নার্গিস বনে।
ঝরা বন-গোলাপের বিলাপ শোনে॥"

"গুলবাগিচায়" অর্থাৎ ফুলবাগানে, ভাষান্তরে গোলাপবনে বুলবুল কাঁদে, সেকি গোলাপের বেদনায় অংশীদার হ'য়ে?

"মদিথ আঁখির সুধায় সাকী ডুবাও আমার এ তনুমন,
আজিকে তোমায় ও আমায় বেদনার বাসর জাগরণ।
মদালসা আঁখি তব, সাকী দিল দোলা প্রাণে,
বাদল ছাওয়া গুলবাগিচায় বুলবুল কাঁদে গজল গানে॥"

অন্য এক রূপেও বুলবুল আবার হাজির। ভোরের আলো ফোটার পর ফুলকুঁড়িদের সবুজ অবগুণ্ঠন সরানোর অপেক্ষাও সে করতে নারাজ। হাঁকডাকে, গলার মিষ্টি আওয়াজে সুর সাধতে সাধতে সে বাগিচা সরগরম করছে। ফুলশাখাতে দোল দিয়ে সে যেন সরসরাঙা ফুলকুমারীদের ঘুম ভাঙাতে চায়:

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে
দিস্ নে আজি দোল।"

এ বুলবুলি কি চেতনার দ্যোতক? সে কি আমাদের অন্তস্থলে সুকুমারবৃত্তি আর সৌন্দর্য্য চেতনার ঘুম ভাঙাতে চায়?

কালের গতি নিরবিচ্ছিন্ন। অন্তহীন এই কালের স্রোত কারোর জন্য থামে না। কবি-শিল্পীর জন্যও না। তবুও চেষ্টার অন্ত নাই কালকে বাঁধবার। স্বভাব চঞ্চল বুলবুল তাই কবির মনোজগতে অধরাকালের প্রতিনিধি হিসাবে দেখা দিয়েছে মাঝে মধ্যে :

"ভোরের স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা
লুকালে সহসা।
মোর তপনের রাঙা কিরণ যেন
ঘিরিল তমসা।
না ফুটিতে মোর কথার কুঁড়ি,
চপল বুলবুলি গেল উড়ি॥"

কাল তো সব কিছুই হরণ করে। কত প্রিয়জনই চলে যায় চিরবিদায়ের পথ ধরে, প্রিয় মুখ হারিয়ে যায়। শোকার্ত হৃদয় থেকে ঝরে আর্তি যাবার ক্ষণে। এই বিষাদঘন মুহূর্তে নজরুলের গানে আবার বুলবুল এসেছে পরাণপ্রিয়র বেশে :

"ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হ'য়ে
আমার গানের বুলবুলি।"

প্রসঙ্গত স্মরণে আসছে কবির অকালে ঝরে পড়া প্রথম সন্তানের আদরের নামটি ছিল বুলবুল। তবে গানটির রচনাকাল সম্পর্কে কিছু বিতর্কের অবকাশ থেকে গেছে।

শেষে একটি সঙ্গত প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার। বুলবুল মানে কি পক্ষীবিজ্ঞানের শর্ত-সম্মত একটি নির্দিষ্ট পাখী? না কি ব্যাপক অর্থে গায়ক পাখী মাত্রই? বিশদভাবে দেখলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমর্থনের জন্য বর্তমানের কবি ইকবালের বহুশ্রুত গানটি একটু স্মরণে আনা যাক :

"সারে জঁহাসে আচ্ছা,
এ হিন্দুস্তাঁ হামারা,
হাম বুল্‌বুলে হ্যায় উস্‌কি,
এ গুলিস্তাঁ হামারা।"

গানের বুলবুল কি শুধুই বুলবুল—সুধীজনেরা এ বিষয়ে আলোকপাত ক'রলে অকুপন সাধুবাদ তাঁদের নিশ্চিত প্রাপ্য।

★ ঝাড়গ্রামের শ্রীমতী অদিতি মাইতি গানের উদ্ধৃতিগুলি বাছতে সাহায্য করেছেন, এজন্য প্রবন্ধকার তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করছে।

টিভি

—সঞ্জয় মুখার্জী

রাত ৭ ৩০টা ; সেন বাবু তাঁদের পাড়ার বিখ্যাত রকে বসে আছেন ; পাড়ায় ল্যাম্পপোষ্টে আছে, কিন্তু ল্যাম্প নেই। মনে হয় পাড়ার নেতাদের সৌজন্যে। রকের একটু দূরে একটা ল্যাম্প-পোষ্টের আলো কলকাতার মানুষের মতই কোনও রকমে বেঁচে আছে, আর তার কাজ করে। একে পাড়ার অন্ধকার তার মধ্যে রাস্তার উপর খুব গভীর বড় গিরিখাত মানুষ গেলার জন্য হাঁ করে রয়েছে, একবার পা ফসকেছে কি আর রক্ষে নেই! একেবারে অমৃতকুম্ভে। তাছাড়া, কলকাতায় মারোয়ারির মতই একদলের রাজত্ব তার মধ্যে ; যার দয়ায় ডাক্তার খেতে পাচ্ছে আর ওষুধের দোকানগুলো মোটা টাকা লুটে নিচ্ছে। এই বিরাট ত্যাগি পুরুষের নাম হল মশা। কয়েকবার এর কামড় খেয়েছ তো পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা ; ডাক্তার কি ১০ টাকা আর ওষুধ তো রয়েছেই।

এ পাড়াটা একটু হুজুকে। India মারডেকায় ১৩টা গোল খেল ; অপর দিকে, আর্জেন্টিনা তাদের বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা খেলোয়াড়টাকে দিয়ে বিশ্বকাপ জিতে নিল। ব্যাস যাবে কোথায়। একেই রাত সাড়ে এগারোটা থেকে পাড়ার প্রতিটি বাড়ীতে যেন মাতালের চেঁচানি শুরু হয়। আবার আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতার ফলে এ পাড়ার আর্জেন্টিনিয়রা সকাল হতেই পাড়ার একটা ল্যাম্পপোষ্টের দুদিকে দুটো বিকট সাইজ-এর মাইক লাগিয়ে দিল ; আর শুরু হয়ে গেল পবিত্র গঙ্গা থেকে একেবারে জনি ওয়েজমুলারের টারজেনের বিখ্যাত গান—"জিলেলে জিলেলে।" বেঁচে থাকো "বম্বে" ; একদিকে পবিত্র গঙ্গাকে নিয়ে মানুষের অত্যাচার, আর একদিকে একটি পশুর একটি নারীকে উদ্ধার ও প্রণাম। সত্যি এখনকার দিনে মানুষে যা করতে পারে না একটা পশু তাই করে গেল—একেবারে Royal Bengal Tiger পর্যন্ত। সত্যি Royal-এর কি পশুত্বতা! এই পশুত্বতা দেখে মানুষ তার মধ্যে একটু মনুষ্যত্ব আনবার জন্য ৯০-এর টিকিট নটাকায় কিনছে। সত্যি বিজ্ঞানের কি লীলা। আর মানুষের কি বুদ্ধি! তাই মনে হয়, ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশী মহাপুরুষ আছে বম্বের Film Industry-তে।

সবে, বাংলার সংবাদের ক্লাস শেষ হবার বেল পড়ল, আমাদের কলেজের মত নয় ; একটু উন্নত ধরণের ; মিউজিক দিয়ে। এরপর, শুরু হবে সাপ্তাহিকি। তার মানে আরও ১ঘণ্টা। পাশে এসে বসতে গেলেন এপাড়ারই একজন বড় বাক্তি চ্যাটার্জীদা। রকে সকালে একটা দলের গল্প হয়ে গেছে—মনে হয়, পাড়ার সেই উচ্ছল ছেলেদের। কারণ, ···সিগারেট ; বিড়ি আর চটির ধুলোয় রকটার একটা Rock-টাইপের ব্যাপার এসেছে।

চ্যাটার্জীদা বসতে গেলেন, সেনবাবু বললেন, একটু সাবধানে বসবেন ; পাশেই এপাড়ার কালু ওপাড়া থেকে একটা ফিকসান সেরে এসে রেষ্ট নিচ্ছে। মেজাজ গরম ; ল্যাজে বসেছেন কি পেটে চোদ্দটা। চ্যাটার্জীদা একটু সামলেই বসলেন।

তিনি সেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন— বাড়ীতে টিভি ছেড়ে এই রকে ?

সেন বাবু বললেন— আর বলবেন না ; কি আর বলব ?

সত্যি বলবার কোনও উপায় নেই। সেন বাবু ভেবেছিলেন টিভি কিনলে সন্ধে বেলা অফিস থেকে ফিরে একটু Relax করা যাবে। আর, তাঁর স্ত্রীকে একটা উপহারও দেয়া যাবে। এক ঢিলে দুই পাখী আর কি। কিন্তু এক ঢিলে দুই পাখী মারতে গিয়ে সে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। একে accident ছাড়া আর কি বলব। যাতে পাড়ার কেউ জানতে না পারে তাই তিনি একদিন নিঃশব্দে একটি টিভি কিনে আনলেন। কারণ, টিভি এসেছে জানতে পারলে আর রক্ষে নেই ! ...পাড়ার এবাড়ী থেকে ও ...বাড়ী থেকে পি পিল্ করে লোক আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে বাড়ীতে ঢুকে পড়বে। তাই, তিনি নিঃশব্দে টিভি কিনে আনলেন ; কেউ জানতেও পারল না। কিন্তু এই দেশের বিজ্ঞানীরা প্রতিটি জিনিষের সঙ্গে একটা গাঁড়াকল জুড়ে দিয়েছেন। বাড়ীতে টিভি এসেছে কেউ জানতে না পারলেও সকাল হতেই তার অ্যালুমিনিয়ামের আঙ্গুলগুলো ছাদর উপর থেকে জানিয়ে দিল, ভাইসব, আর ভয় নেই ; আমি এসে গেছি আর দেরি নয়, আক্রমন কর। টিভি আসার পর থেকে বাড়ীতে ঢোকবার প্রথমেই বিভিন্ন মাপের বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন কোম্পানীর চটির, প্রদর্শনী—একেবারে রাস্তার ফুটপাত থেকে গড়িয়াহাটের বাটা-দোকান পর্যন্ত। এটা হল প্রথম দর্শন ; ...তারপর অন্দরমহলের দর্শন ; ঘরের মধ্যে একদিকে মহাপ্রভু বিষ্ণুপাদের মত বসে রয়েছে টিভি পাদ। আর তাঁর চারদিকে তাঁর ভক্তরা তাকে ঘিরে দেখছেন তাঁর লীলা। আজকে শনিবার ; তিনি তাঁর লীলায় দেখাচ্ছেন উত্তম—সুচিত্রার "সপ্তপদী"। এই লীলা দেখবার জন্য ৬ মাসের শিশু থেকে একেবারে ষাট বছরের মহিলা পর্যন্ত উপস্থিত। ঘরের মেঝেতে পাতা কার্পেটটা মাদুর ও লাক্সথ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতে মানুষ বসছেও , মন্তব্যও করছে, হাতাহাতি করছে ; আবার তাতে চলছে ৬ মাসের শিশুর Practical কাজ। হঠাৎ দেখা গেল নায়ক-নায়িকা ভটভটিয়ায় চেপে অজানা পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে আর গাইছে "এই পথ যদি না শেষ হয়।" তোমাদের পথ হয়ত শেষ হবে ; কিন্তু এদের আক্রমন আর শেষ হবে না। হঠাৎ National Prog amme-এর বিকট মিউজিক বেজে উঠল। তার মানে লীলাপর্ব শেষ। কিন্তু তা কতক্ষন এরপরেই শুরু হবে ভারত ভাগ পর্ব।

সেন বাবু ঘরে ঢুকে দেখলেন ঘরের Condition খুব খারাপ। টেবিলের উপর রাখা টেবিল ল্যাম্পটার বিরাট শেড্‌টা কার্পেটের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। কার্পেটের উপরকার খানিকটা অংশের রঙ গাঢ় হয়ে গেছে। এই অবস্থা দেখে সেনবাবু ঠিক করলেন Relax করার চেয়ে আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি এই মহাপ্রভুকে, এই বিজ্ঞানের আশ্চর্য লীলাকে তিনি তাঁর বাড়ী থেকে অন্য এক রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

অবলম্বন

—শিবশঙ্কর ব্যানার্জী

বাইরের সভ্যতা বাস্তবতা—তারই মধ্যে বাইরের 'আমি'। সেখানে ক্রুর জিঘাংসা, শয়তানের শয়তানি আর সবার মধ্যেই সেরকম একটা বাইরের 'আমি' একটা 'আমির খোলস' নিয়ে এগিয়ে চলার প্রতিযোগিতা—মনুষ্যত্বের লাস-চক্ষুলজ্জার লাস-মানবিকতার লাস খালি যান্ত্রিক মানুষের জীবন্ত—অস্থির আর অগ্রীদের নরকের প্রেতসম হাসি। সৃষ্টির আদিম থেকে বহু স্তর উত্তোরণের পর আবার আমাদের সভ্যতা এসে পরেছে সেই আদিতে। সব হাত পাওয়ালা ডাইনোসোরাস্ ঘুরে বেড়াচ্ছে—ধ্বংসের আর জিঘাংসার তাড়নায় ছুটে বেড়াচ্ছে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো। ক্ষুধা, খালি ক্ষুধা—শরীরের ক্ষুধা, পেটের চাহিদা, টাকার চাহিদা .....। পেট ভরলো তো পুঁজি ভরলো না, পুঁজি ভরলো তো বাসনা রইল অতৃপ্ত; তাই মিটলো তো এলো আর একটা 'অতৃপ্তি'; তুমি সর্বনাশের অশনি সংকেত ...খাণ্ডবদহনের মতো সভ্যতাকে দহন করো—কেউ যেন রেহাই না পায়। গরীবের রক্ত ও সঞ্চয় নিয়ে ময়দানবকে দাও—আর ময়দানব নিজের খেয়াল খুশী মতো ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরী করে। ময়দানবের ইন্দ্রপ্রস্থ—কলিযুগে তা আর একটা নয়—বহু। দশতলা, কুড়িতলা, পঁচিশতলা .....। আর রক্ত-হীন বঞ্চিত মানুষগুলো রক্ত দেবার আগেও রাস্তায় পরেও রাস্তায়। —"মাগো, দুটো ভিক্ষা দাও মা।" —"বাবু একটা কাজ দিন বাবু", " ...স্যার আমি বি কম পাশ, একটা চাকরী দিন স্যার", "...দেখুন আমরা এক প্রকার নতুন ধুপকাঠি তৈরী করেছি, ১ টাকা প্যাকেট, ...প্রতি প্যাকেটে দশটা," ....."বাবুরা, অন্ধ ছেলেটা চোখে দেখে না; একটু দয়া করুন, ..."।

হাহাকার—হাহাকার, আর বঞ্চনা। ওদিকে আবার সৌখিন Reformist বলেন—"দেশ-বাসীরা, শুনুন, এ অসাম্যের ভেদজ্ঞান দূর করতে হলে আমাদের এক জোট হতে হবে। ধনী দরিদ্র সব হবে সমান .....বিপ্লব আনুন, বিপ্লব নিয়ে ভাবুন বিপ্লব করুন। রাশিয়াকে দেখুন, ... লেনিন বলেছেন—'বিপ্লব করতে হলে আমাদের আগে নিজেদের অবস্থা, পাওয়া না পাওয়া ও পুঁজিবাদীর বঞ্চনাকে জানতে হবে।' জানুন—আসুন আমরা সবাই মিলে বলি—'Equality, Fraternity and Liberty. এগিয়ে চলুন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, আমি আছি .....। বলেই চলে, দুর শালা, বুলি দিয়ে কি হবে? চাল দিবি, ডাল দিবি না চাকরি দিবি?

.....রাস্তার ধারে ধারে চোলাই মদের আড্ডা, ড্রেনপাইপের মধ্যে মানুষের ঘর, কুকুরের সঙ্গে ডাষ্টবিনের খাবার নিয়ে খাওয়া লড়াই, ...এই সমস্তই হচ্ছে সভ্যতার বাইরের খোলস। বোমাবাজি, রাহাজানি, ছিনতাই, সব দেখি.....আমি। আমার বাইরের 'আমিকে' এই সব তিক্ত অভিজ্ঞতার বুলেট ক্ষতবিক্ষত করেছে। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পরছে—ধরণী দ্বিধা হও।

পায়ে পায়ে ধূলা উড়িয়ে চলেছি। উদ্দেশ্য সভ্যতার অন্দরমহল—হয়তো তা এই বহিস্থ আবরণের মতো রুক্ষ নিকরুণ হবে না। যে সভ্যতাকে আজ বিষকুম্ভ মনে হয়, তাকে হয়তো বা অমৃতকুম্ভ বলতে পার।

রঙীন নেশার রাজ্য। সবাই হাসছে খাচ্ছে, উপভোগ করছে। আমি এখন ইন্দ্রপ্রস্থে, উপনীত। সুরা, নারী, শঠতা, পরকীয়া প্রেম, গোপন অভিসার, ধর্ষণ আর বিশিষ্ট কিছু দেশ-নেতাদের কার্যালয়—সবই এক সূত্রে গাঁথা—খালি রূপের ও প্রকাশের রকমফের- স্বভাবে সবই এক —"ওরে রামু—ও ব্যাটাকে শেষ করে দে। নয়তো ওই অঞ্চলে ভোট পাবো না। কাজ হয়ে গেলে দশ হাজার—ও হ্যাঁ, দোষটা জানি আমাদের উপর না আসে। .....কে, ও ললিতা তুমি! ঠিক আছে আমি আজ ফ্রি। ও হ্যাঁ, সাবধানে এসো। জানোই তো পুলিশ আজকাল হোটেলেও illegal prostitution-এর ব্যাপারে রেডি করছে'। ....."শোনো, আজ রাতেই মাল পাচার করতে হবে।" পুলিশ খবর পেয়েছে। যত পারো লুকিয়ে ফেলো। ইনকাম্ ট্যাক্স আমি ম্যানেজ করে ফেলেছি। ....."কি বললি! আমার সব মাল ধরা পরে গেছে। শালা কুত্তা কাঁহিকা, যেভাবে পারিস ওদের নিয়ে পালিয়ে আয়.....।"

এই রকম অসংখ্য জ্বলন্ত দলিল পাশ হয়ে ছড়িয়ে পরছে সারা শহরে-জ্বলছে সন্ত্রাসের আগুন, বারে নাচছে লাস্যময়ী, সুন্দরী পরিবেশিত হচ্ছে বিলিতি খানা, মদ ও যুবতীর শরীর.....। পাঁচতারা হোটেল, কালো টাকা সাদা হচ্ছে, ক্যাবারে হচ্ছে, জীবন- যৌবন, নেশা, মাদকদ্রব্য। ..... কিন্তু অন্তিমে, সেই অতৃপ্তি; আপন শাশ্বততার বিকশিত। ভিতরের সভ্যতা বাহিরের মতো শুষ্ক নয়, কিন্তু বড়ো পঙ্কিল। ধূলো মাখা পায়ে ঢুকে কাদা মাখা পায়ে বেড়োলাম।

মুক্তি নেই—বন্ধন আর বন্ধন—লোভের বন্ধন আশার বঞ্চনা ও অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস। একের পর এক সব তৈরী করছে নরকের সোপানশ্রেণী। চারিদিকে প্রমিথিয়ুসের হাহাকার। তাইতো মুক্তি চাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন এবার আলোয় ফেরার সময় এলো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায়—হতভাগ্যরা সেইদিকে ছোটে। কিন্তু পৌঁছে দেখে আর এক প্রহেলিকা। স্তরের পর স্তর দেখি একই সুখের তাৎক্ষণিকতা—চিরন্তনতা কোথায়? "Where are you? Eternity of peace..... ?" শিক্ষা দীক্ষা আনছে রুচিহীনতা—বিকলাঙ্গ করছে সমাজ ব্যাবস্থাকে। তাই তো অভিজ্ঞতার বিষে আজ আমি পরিশ্রান্ত—এবার বিষ ঢালতে হবে। কিন্তু কোথায়—নীলকণ্ঠের সেই বিষ পরিত্যাগের শান্তি।

হ্যাঁ, তা আছে—তোমার কাছে—চিত্রা। আমার ভিতরে আমার মনের রঙিন কল্পনার অন্দরমহলে।

এই সভ্যতাকে অতিক্রম করেও তোমায় দেখতে পাচ্ছি। ছোট্ট সেই গ্রামে। যেখানে আমার শৈশব কেটেছে। গ্রামের পাশ দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। বড় বড় ধানখেত—তারই শিয়ের

মধ্যে তরঙ্গায়িত হচ্ছে সায়াহ্নের হিমেল বাতাসের মৃদুমন্দ দোলা। যেন সমুদ্রের ঢেউ উঠেছে। অস্তমিত সূর্যের শেষ রাঙা আলোয় রাঙিয়ে উঠেছে পশ্চিমের আকাশ। লাঙল নিয়ে ধরিত্রীর সন্তান চাষীরা ঘরে ফিরছে। আরো দূরে তাল গাছের ঝাড়ে দোলা লেগেছে—পড়ন্ত বেলায় যেন অস্তিনের আহ্বান। কি এক বিহ্বলতা—এক মোহময় অনির্বচনীয়র আমন্ত্রণ। তারই মাঝে—ওই যেন তুমি—চিত্রা—আমি আমাদের সংসার—ছোট্ট সুখের নীড়টুকু। যেখানে কোন অধিকের চাহিদা নেই। অতৃপ্তি নেই, কলুষিত মলিনতা নেই। যেখানে আমরা কেউ যন্ত্র নই। সবাই মানুষ—পবিত্রতায় ভরপুর—উচ্ছ্বাসে ডগ্‌মগ্‌। তুমি যেন অফুরন্ত সঞ্জীবনী—অসীমা। তাই তো সোঁদা মাটির গন্ধেও তোমার আমেজ পাচ্ছি। আকাশের বুকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘেও তোমায় দেখছি—তুমি যেন তাকালে আমার দিকে, বললে—"আনন্দম্‌, অনন্তমঃ, শুভং . , সারাদিন পরে আমি ঠিক শহরের মতোই আমার পায়ে পথের ধূলো উড়িয়ে বাড়ী ফিরবো। তুমি তেপায়া পেতে বসে আমায় হাওয়া করবে—আমি ঘর্মাক্ত, পরিশ্রান্ত মুখে তোমায় দেখবো—ডুরে রঙের শাড়ী পরনে তোমার। মুখে হাসি, তা দেখে আমিও হাসবো। ভুলে যাবো এই শহরকে—এই বুলেটের যন্ত্রণাকে।

জীবনের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম কি জানো চিত্রা—মনের চিত্রপটে তোমার এই চিত্রকে চিরকাল অঙ্কিত করে রাখা। এই বর্তমানের বেঁচে থাকার সংগ্রামের ধূসর আবর্তে তুমি হারিয়ে যাও। বিদগ্ধ মনের মলিনতা দিয়ে তোমায় আমার সেই মধুরতম স্মৃতিগুলোকে আর রাঙিয়ে তুলতে পারি না। সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাতে হারিয়ে যায় আমার মনের রঞ্জক, আর ঠিক তখনই নিঃস্তব্ধ প্রহরগুলি। কখন তুমি হারিয়ে যাবে। আর আমিও মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে যন্ত্র হতে পারবো।

কিন্তু এই আশঙ্কা নিয়েও আমি বেঁচে আছি। আমি আমার মতো আরো সবাই। এইসব মনুষ্যত্বহীন মানুষদের মধ্যে। আমরাও ধীরে ধীরে তাই হয়ে যাচ্ছি। নিষ্করুণের উত্তপ্ততা আমাদের মানবিক সত্বাকে নতুন ছাঁদে ঢালাই করে চলেছে। এক মধুরতায় ধুম্রজাল—কামনার চুল্লী থেকে নির্গত হয়ে আচ্ছন্ন করছে আমাদের অন্তরীণ মানুষগুলোকে, যেখানে সব অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম, কর্ম, চরিত্র বাসনা, চেতনা । সমস্ত হচ্ছে এক পাশবিকতার জোয়ারে আপ্লুত। আমার সব চলে যাক—'I don't care for the whole world—except you ... তুমি যেওনা, যতদিন তুমি থাকো ততদিনই আমি বুঝি যে আমি মানুষ। আর সমস্ত কিছু এই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এগিয়ে চলুক।

তাই এই ১৯৮৬-র বর্তমানকে আমার অনুরোধ, সে যেন আমায় এটা না মনে করিয়ে দেয় যে 'চিত্রা' কেবলই একটা বিধ্বস্ত শহরে ছেলের কল্পনা। কারণ চিত্রা কেবল চিত্রই নয় সে আমার মনের সেই অন্দরমহল যাকে অবলম্বন করে একটি নাগরিক বেঁচে থাকে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য।

রবীন্দ্রচর্যা

—অধ্যাপক অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন মানুষই, তিনি যত বড় মাপের হউন না কেন, তাঁর সময়কার ঐতিহাসিক/সামাজিক প্রেক্ষাপট নিরপেক্ষ হয়ে অন্যদের কাছে সঠিক বোধগম্য হবেন না। আমরা সাধারণ মানুষেরা অবশ্য প্রায়ই বলে থাকি—অমুক মানুষটি তাঁর সময়ের আগেই জন্মেছেন; বা ঐ ব্যক্তিকে তাঁর যুগের মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরণের "advanced" বা "অতি অগ্রসর" ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক সুন্দরভাবে বলেছে: যাঁকে আমরা তাঁর যুগের তুলনায় "অতি অগ্রসর" মনে করছি সেই মানুষটি আসলে অনেক নিবিড়ভাবেই তাঁর যুগের। অর্থাৎ তারাই বড় মানুষ যারা অনেক ঘনিষ্ঠভাবে, অনেক নিবিড় ভাবে তাদের যুগকে বুঝেছে এবং সেইমত তাদের যুগের মূল ধর্ম ও প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করেছে। আমাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঐসব পথ নির্দেশ "অতি অগ্রসর" চিন্তার প্রকাশ বলে মনে হয়। আমরা যদি একটু বেশী সময় নীয়ে, একটু বেশী পরিশ্রম করে নিজের নিজের যুগ ও সমাজকে জানবার, বুঝবার চেষ্টা করি তবে দেখব আমাদের ঐ বড় মানুষদের চিন্তা-কর্মগুলো আমাদেরই প্রত্যাশিত চিন্তা-কর্ম।

প্রশ্ন হতে পারে এই ভাবে যে কোন মানুষের চিন্তা-কর্মকে তাব যুগের ইতিহাস ও সমাজের প্রেক্ষাপটে বেঁধে দিলে আমরা কি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশাল ব্যক্তিত্বদের প্রতি কিছু অবিচার করবনা? তা'হলে এই সব মানুষের চিন্তা কর্মকে "যুগোত্তীর্ণ," "কালোত্তীর্ণ" বলা নিতান্তই ভুল বলা? তবে সমাজের প্রগতই বা কি হিসাবে বিবেচ্য? বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-কর্ম প্রসঙ্গে আমরা কি একথাই বলতে যাচ্ছি যে, কবির মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ (৪৫) বছর পরে আমরা তাঁর চিন্তা-কর্মের তেমন কোন প্রাসঙ্গিকতা দেখছি না?

প্রশ্নগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন অবকাশ এখানে না থাকলেও বর্তমান নিবন্ধের প্রয়োজনে প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত বক্তব্যের সমর্থনে আরও দু-একটি কথা বলতে হয়:

কোন মানুষের চিন্তা-কর্মের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে, মানুষটির সর্বকিছুই সুনির্দিষ্ট ভাবে একটি ছোট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। সমাজ-ইতিহাসের কথা মনে রাখার অর্থ হ'ল ঐ বিশেষ মানুষটির চিন্তা-ভাবনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসাবে নির্দিষ্ট সামাজিক অর্থ নৈতিক শক্তিগুলোর প্রকৃতি অনুধাবন করা, আর তা করলেই মানুষটির চিন্তা-কর্মের গুরুত্ব তার পরবর্তীকালের সমাজে কতটা অনুভূত হতে পারে তা অপেক্ষাকৃত সহজে প্রকাশ পাবে। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট মানুষটি আজও আমাদের কাছে কতটা চর্চা ও চর্যার বিষ তা বুঝতে গেলে এই "কালগত"

ব্যাপারটি বোঝা দরকার। কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চ্চার প্রশ্ন হলে এত কথা বলার প্রয়োজন হত না। কিন্তু শিরোনামে জানিয়েছি আমাদের আলোচ্য বিষয় হল রবীন্দ্রচর্যা, কেবল নিখাদ রবীন্দ্রচর্চ্চা নয়।

রবীন্দ্রচর্চ্চা হ'ল রবীন্দ্র অধ্যয়ন। রবীন্দ্রচর্যা হ'ল রবীন্দ্র-আচরণ। প্রথমটি হল গবেষণা, আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ব্যাপার যা আগামী বহু শতাব্দী ধরেই চলবে, চলতে পারে, যেমন চলেছে কালিদাস বা সেক্সপীয়র নিয়ে গবেষণা-আলোচনা। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ রবীন্দ্র-চর্যা হ'ল একটা জীবন বোধকে, একটা জীবনদর্শনকে অনুসরণের ব্যাপার বা তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপার যা কিছুতেই সদাপরিবর্তনশীল জগতে অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। তাই প্রশ্ন হল: এখনও অর্থাৎ কবির মৃত্যুর ৪৫ বছর পরও কি তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনবোধকে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে?

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশ তথা পরাধীন ভারতের মানুষ। আটত্রিশ-উনচল্লিশ বছরের স্বাধীন ভারতে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক প্রবাহের জটিলতা বিদ্যমান সেখানে রবীন্দ্র-জীবন বোধের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি? এ প্রশ্ন নিয়েও দীর্ঘ-আলোচনার অবকাশ থাকে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা সেই আলোচনার একটু ভূমিকামাত্র উপস্থিত করব।

সভা-সমিতিতে এখনও আমরা একটা কথা বলি (অনেক সময় কথাটির সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব উপলব্ধি না করেই)—কথাটি হ'ল: রবীন্দ্রনাথ একটি Institution এই সব সভায় কথাটির ব্যাখ্যা হয় না। রবীন্দ্রচর্যা শীর্ষক এই নিবন্ধে এই "Institution" কথাটিরই ব্যাখ্যা করা হবে।

Institution এর অর্থ হল "প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা"। আর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বলতে হয় কিছু বিধি-রীতি, নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধের সামগ্রিক প্রকাশ। যেমন প্রশাসন বিভাগ একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; যেমন রাজনৈতিক দল একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; যেমন বিবাহও একটি প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। তবে একজন ব্যক্তিকে কিভাবে পৃথকভাবে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বলা সম্ভব। অবশ্যই এখানে ওই Institution নামক সমাজতাত্ত্বিক ধারণাটি অলঙ্কার (Rhetoric) হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এবং রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে সেই অলঙ্কারে বিভূষিত হতে পারেন। এবং আমরা বলতে পারি, যেমন আমরা বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তেমনই রবীন্দ্রনাথ নামক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটিকে অনুসরণ করে অর্থাৎ রবীন্দ্রচর্যার মাধ্যমেও আমরা উন্নততর জীবনধারা (Culture অর্থে) গড়ে তুলতে পারি। রবন্দ্রচর্যার প্রধান কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ করে এই ভূমিকাটি শেষ করা যেতে পারে।

প্রথমত, ভারতীয়তার (Indian Idenlity) যে সঙ্কট আজ আমরা দেখছি তার দূরীকরণে প্রধানতম যে দায়িত্বটি যা হল ভারতের সমাজিক স্তরবিন্যাস সমস্যাটির মোকাবিলা করা তার কথা রবীন্দ্রনাথই বার বার জোরালভাবে উপস্থাপিত করেন। তথাকথিত শূদ্রের হীনমান্যতা এবং তথাকথিত উচ্চ বর্ণের আত্মাভিমান উভয়কেই নির্মমভাবে আক্রমন করার কথা তিনি বলেন, ফলত এই বিষয়ে রবীন্দ্রচর্যাই হ'ল আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যটি মোকাবিলার উপায়।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ভারতে শিক্ষা নিয়ে এবং শিক্ষার মাধ্যমেও রকমফের নিয়ে যে নানা বিধি জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে সেই ব্যাপারেও রবীন্দ্রচর্যা দিশারী হতে পারে। শতাব্দীর শুরুতেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে শিশের দশকে বিশ্বভারতীয় চিন্তায় উত্তরণ এবং তার স্বল্পকাল পরেই শ্রীনিকেতনের মডেল এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা-কর্মের যে বিবর্তন ঘটেছে অনুসরণ করে আমরা আজকের দিনেও এই বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। শান্তিনিকেতনের প্রাথমিক ভাবনায় যে সনাতন হিন্দু সমাজের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পেয়েছিল, কবি অচিরেই তা অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত উদার শিক্ষা-চিন্তায় নিমগ্ন হন যার প্রকাশ ঘটে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায়। একটা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া এখানে লক্ষনীয়। শান্তিনিকেতন নামক যে thesis তারই যেন Antithesis ঐ বিশ্বভারতী। শ্রীনিকেতন কর্ম শিক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার মিলন ঘটিয়ে এক ধরণের Synthesis এ উত্তরণ ঘটল যেন।

তৃতীয়ত, আজকের ভারতে সাধারণ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উন্নতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান যে প্রক্রিয়াটি আমরা অবলম্বন করতে চাই-যা হ'ল Co-operative বা সমবায়ের নীতি সেই সমবায়—সহযোগিতার প্রক্রিয়াটি আমরা সকলেই জানি রবীন্দ্রনাথই প্রথম চালু করেন।

এভাবে রবীন্দ্রচর্যার নানা দিক উদ্ভাসিত হতে পারে। অবশ্যই তা রবীন্দ্রচর্চ্চার ফল হিসাবেই দীপ্যমান হবে। রবীন্দ্রচর্চ্চার সঙ্গে রবীন্দ্রচর্যার এই নিবিড় যোগাযোগের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের মননশীল গন্থরচনা ও প্রবন্ধাদি অধ্যয়ন-অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব। অর্থাৎ রবীন্দ্রচর্চ্চাকে নিছক সাহিত্য সেবা হিসাবে না দেখে, সমাজতাত্ত্বিকে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রবীন্দ্রচর্চ্চাকে রবীন্দ্রচর্যার উপযুক্ত করার একটা গুরুদায়িত্বই রয়েছে। কবির ১২৫ তম জন্মবর্ষে আমরা এই দায়িত্বের কথাই বিশেষভাবে মনে রাখবো।

শিল্প সংস্থায় কম্পিউটার স্থাপন—একটি পর্যালোচনা

—অনিরুদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের নতুন কেন্দ্রীয় সরকার নব্য প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা ভারতকে একটানে এই বিংশতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাবেন। না কাল্পনিক কোনো স্বপ্নবিলাসের মাধ্যমে নয়, হাই-টেক (Hi-tech) আন্দোলনের মাধ্যমে। ভারতবর্ষ নামে রুগীটির দেহে এতদিন ধরে যে রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছিলো—যথা দারিদ্র, বেকার সমস্যা, অপুষ্টি ইত্যাদি তা এখন সমূলে উৎপাটিত হতে চলেছে, দিল্লীর রাজদরবারে রাজবৈদ্যর হাতে তা ধরাও পড়ে গেছে, রোগের নাম "ক্রমবর্ধমান পশ্চাতধাবন।" ওষুধও পাওয়া গেছে, দেশী ওষুধ নয়! একেবারে বিলেত থেকে আমদানি করা ওষুধ! ওষুধের নাম কম্পিউটার। ওষুধ ব্যবহারের নিয়ম—আরও আরও কম্পিউটার, সর্ব্বাঙ্গে কম্পিউটার। বিদেশী উপাধিপ্রাপ্ত এই রাজবৈদ্যের ওপর রুগীর আত্মীয়স্বজনদের অগাধ আস্থা (!) তবুও তার মধ্যে দু একজন নিন্দুক ফোড়ন কাটে "এই চেহারায় হ্যাঁচকা টান সহ্য হবে তো ফিক্ ব্যাথা না লাগে?" কেউ কেউ আবার গলা বাড়িয়ে বলে ওঠে যে "রুগী তো জন্মের পর থেকেই এই রাজ-বৈদ্যর দাদু বা মায়ের চিকিৎসাধীন ছিলো, আপনারা তো রোগীর Family Physician, তাহলে এ রোগ হলো কেমন করে?" যাকগে নিন্দুকের কথায় কান দিতে নেই।

প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত ঘোষণার পর পরই আমরা শুনতে পেলাম আরও ঘোষণার শব্দ যার শুরু নতুন কম্পিউটার পলিসি (১৯শে নভেম্বর, ১৯৮৪) দিয়ে। আর যার পর পরই এলো কেন্দ্রীয় বাজেট ৮৫-৮৬ (১৬ই মার্চ ১৯৮৫) নতুন ইলেক্ট্রনিকস্ পলিসি (২৩শে মার্চ ১৯৮৫) এবং আমদানি রপ্তানি পলিসি (১২ই এপ্রিল, ১৯৮৫)।

বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় একথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য যে শ্রমিকের কাজের বোঝা হালকা করতে বা তার জীবনধারণের পথকে সহজ করতে কম্পিউটারের ব্যবহার চালু হচ্ছে। এ বিষয়ে শ্রীরন্ ফ্রানসিস্, একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের উক্তিটি পড়লেই ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হবে। শ্রীফ্রানসিস্ তাঁর "Economic Causes And Effects of Automation" এ মন্তব্য করেন যে—কোনো পুঁজিবাদী সংস্থার উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলার পেছনে যুক্তি হিসেবে মুনাফা ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। প্রত্যেক পুঁজিপতি ব্যক্তিগতভাবে কিছু পুঁজিবাদী আইনের নাগপাশে আবদ্ধ, এবং সে কখনই চাইলে শ্রমিকের কাজের বোঝা হালকা করতে বা তার জীবনধারণের পথকে সুগম করে তুলতে পারে না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে অটোমেশন (Automation) মুনাফা লাভের একটা সরল রাস্তা মাত্র।

শ্রমক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রয়োগের ষড়যন্ত্রে ভারতবর্ষ এক নতুন শিকার। এর বহু আগে আক্রান্ত হয়েছে তথাকথিত উন্নত পশ্চিমী দেশগুলি কম্পিউটার চালু করার ব্যাপারে তাদের মতামতগুলো এবার তাহলে দেখা যাক। ১৯৫৬ সালে ব্রিটেনের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বিভাগের এক মুখপত্রে (Automation, Her Majesty's Stationery Office, Pg No. 65) বলা হয় "শিল্পে অটোমেশন তখনই সাফল্য লাভ করতে পারে যদি দেশে বেকারিত্ব না থাকে, কারণ তাহলে অটোমেশন চালু হওয়ার ফলে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিককে অন্যত্র সুযোগ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। ১৯৪৫ সালে ব্রিটেনে পণ্য সামগ্রীর এক প্রচণ্ড চাহিদা দেখা দেয় এবং বহু কলকারখানায় শ্রমিকের অভাব অনুভূত হয়। দেশের অর্থনীতির এই চেহারা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে শিল্পে অটোমেশন এক আপাতঃ বেকারিত্ব ছাড়া আর কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। যদিও যে কারখানা থেকে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছেন অটোমেশনের জন্য সেই কারখানা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে অপারগ।" এই হচ্ছে শিল্পে অটোমেশনের অন্যতম প্রবক্তা ব্রিটেনের বক্তব্য। কিন্তু এই ব্রিটেনকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে—১। শিল্পে অটোমেশন চালু করতে গেলে সারা দেশে বেকারিত্ব বিলোপ করতে হবে।

২। দেশে তখনই কম্পিউটার বা অটোমেশন চালু করা যেতে পারে যখন সারা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকের চাহিদা বর্ত্তমান থাকবে।

এ হলো পঞ্চাশের দশকের কথা, আর আজ সেই দেশে শিল্পে অটোমেশন চালু হওয়ার ফলে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত টাইম্ (Time) পত্রিকায় (১৮ই মার্চ, ১৯৮৫ সংখ্যা) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে—ব্রিটেনের বেকারিত্বের হার ১৯৮০ সালে যা ছিলো—৬.৩% তা ১৯৮৫ সালে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—১২.৬%। হল্যাণ্ডে বেকারিত্ব বেড়ে দাঁড়িয়েছে—১৪%। সমগ্র ইউরোপে বেকারিত্ব ৬.১% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৮%। এড্ওয়ার্ড বি শিলস্ (Edward. B Shils) এর অটোমেশন এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিলেশনস্ (Automation & Industrial Relations) অনুসারে ১৯৫৫ সালে যে বিজ্ঞানীরা অটোমেশনকে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী বলে ভাবেন নি তাঁরাও এখন মত পালটাতে বাধ্য হয়েছেন।

এবার তাহলে আমাদের নিজেদের দেশের অবস্থাটা দেখা যাক। আমার সোনার দেশ, বেকারিত্বের পবিত্র তীর্থভূমি, অপুষ্টির বারানসি ক্লোজার ছাঁটাইয়ের মক্কা ভারতবর্ষের রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা ২.১৯ কোটি, তার মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১০১.৮ লক্ষ। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange) যারা নাম লেখায় তাদের ১০% ও চাকরী পায় না। আর সারা ভারতে এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের রোল নম্বরহীন কত বেকার আছে বলুন তো? পাশাপাশি চাকরির ক্ষেত্রগুলির অবস্থাট কিরকম? বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার সংখ্যা—৯৪ হাজার। রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই রকম হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় ১৩০০ টী ক্লোজারে (Closure) চাকরী

হারিয়েছেন। ১,৬০,৩৫৪ জন শ্রমিক (১৯৮০ সালের জুন মাস পর্যন্ত।) সমান্তরালভাবে বেকারীর হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন শিল্পে কম্পিউটার প্রয়োগ। কেরালার "বিজ্ঞান কারিগরি ও পরিবেশ কমিটির" অধ্যক্ষ অধ্যাপক ভি কে দামোদরণের মতে "ভারতে প্রথম কম্পিউটার আসে ১৯৫৫ সালে তার পর থেকে দেশে এর সংখ্যা বেড়েছে হু হু করে, ১৯৭৫ সালে যা ছিলো ১০০০, ১৯৮৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,০০০ যা আশা করা যায় ১৯৯০ সালে বেড়ে দাঁড়াবে ১,০০,০০০। কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেক্টনিকস্ বিভাগের (D.O E) একটী রিপোর্ট অনুসারে ১৯৮৫—৯০ সালের মধ্যে ভারতের সরকারী ক্ষেত্রে কম্পিউটার চাহিদা হলো এই রকম—

কি রকম কম্পিউটা	চাহিদা
১। মাইক্রো কম্পিউটার	১,৩৫,০০০টি
২। মিনি কম্পিউটার	৪,৩ ০টি
৩। মিডি কম্পিউটার	৬৩২টি
৪। লার্জ কম্পিউটার	১৩৯টি
৫। সুপার লার্জ কম্পিউটার	১৬টি

উপরোক্ত তথ্য দুটী থেকে ভারতের অর্থনীতিতে এই মিনি, মিডি, ম্যাক্সির অনুপ্রবেশের গতি যে কত তীব্র তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক দামোদরণের মতে কর্তৃপক্ষ যেখানেই কম্পিউটার চালু করছেন সেখানেই আশ্বাস দিচ্ছেন যে কম্পিউটার তৈরীর কারখানাতে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিককে নেওয়া হবে। কিন্তু ১৯৯০ সালের মধ্যে যে সব বড় বড় শিল্প সংস্থায় কম্পিউটার চালু হতে চলেছে যথাক্রমে রেল, ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্স ইত্যাদি এক্ষেত্রে ওরকম সমান্তরাল শ্রমিক বদলির (Horizontal Shift of Workers) সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এবং যেহেতু আমাদের দেশে শ্রমিকদের এক বৃহৎ অংশই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কলকারখানায় কাজ করেন, এবং এটা সর্বজনগ্রাহ্য মত যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুনাফার প্রতি নজর রেখেই কম্পিউটার চালু হয়ে থাকে। তাই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাটাই হবেন, শিল্প সংস্থাগুলিতে কম্পিউটার চালু হওয়ার জন্য।"

অধ্যাপক দামোদরণের মতামত যে কতটা সঠিক তা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (Encyclopedia Britanica) এবং এনসাইক্লোপিডিয়া এ্যামেরিকানা (Encyclopedia Americana) থেকে দুটী তথ্য দিলেই বোঝা যাবে।

সংস্থার নাম	শ্রমিক সংখ্যা		হ্রাস পেয়েছে	হ্রাসের শতাংশ
	১৯৬০	১৯৮০		
মার্কিন রেল	৭,৮০,০০০	৫,০০,০০০	২,৮০,০০০	৩৬%
ব্রিটিশ রেল	৫,১৪,৫০০	১,৭৭ ৮১৪	৩,৩৬,৬৮৬	৬৫%

এবার একটু ভারতের দিকে তাকাই নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর অনুসারে টীসকোতেই (Tisco) অটোমেশনের প্রথম পর্যায়ে ছাঁটাই হবে ১২০০ জন শ্রমিক। তাই বিজ্‌নেস স্ট্যাণ্ডার্ড (Buisness Standard) পত্রিকায় ১৯৮৫ সালের ১৩ই মে সংখ্যায় সঠিক ভাবে মন্তব্য করা হয় "The free for all sparked off by the department of electronics (D.O.E.) policy cannot fit into a country short on finance long on labour"

কানাডার দুজন প্রখ্যাত পদার্থবিদ E. W. Lever এবং J. J. Brown শিল্পে অটোমেশন চালুর জন্য ৮টি সূত্র নির্ধারণ করেছেন যার প্রথম কটি সূত্র হলো—

১। যন্ত্র যেখানেই পারবে মানুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে।
২। যন্ত্র পারে এমন কাজ মানুষকে করতে দেওয়া হবে না।
৩। মানুষের কার্যক্ষমতা কমাতে হবে।
৪। মানুষ যন্ত্রের বশ হবে।

মজার ব্যাপার, আমাদের দেশের করেকজন যখন কম্পিউটার চাইছেন তখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ কম্পিউটার তৈরীর সংস্থা আই. বি এম কর্পোরেশনের (I. B Corporation) সম্পাদক শ্রীথমাস জে ওয়াটসন মন্তব্য কয়ছেন যে "কম্পিউটার বা অটোমেশন শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী এ কথা তর্কাতীত, এবং এর জন্য শিল্পে শ্রমিক ছাটাই হয়। এবং শিল্প সংস্থাগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা কমানো আমাদের একটি বড় বর্ত্তব্য।" অথচ বেকার সমস্যায় জর্জর আমাদের দেশের কিছু ধান্দাবাজ রাজনীতিবিদ শিল্পে অটোমেশন বা কম্পিউটার স্থাপনের দাবী তুলছেন যখন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিলেসনস্ (Institute of industrial relations)এর জ্যাক রজার্স মন্তব্য করে "শিল্পে কম্পিউটার স্থাপন হলে শ্রমিকদের চাকরি চলে যাবে এ কথা ধ্রুব সত্য"।

বর্ত্তমানে আরেকদল ধনীদের পোষা রাজনীতিবিদ এবং কিছু সাংবাদিক যাঁরা ভীষণ ভাবে ধনীদের দালালি এবং Yellow journalismএ অভ্যস্ত একটা নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছেন শিল্পে কম্পিউটার স্থাপনের জন্য, তাঁরা বলে বেড়াচ্ছেন যে—আজ যারা শিল্পে কম্পিউটার স্থাপনের বিরোধীতা করেছেন এরা ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের বিরোধী শক্তির মতো মূর্খ। এই অপপ্রচারের কারণ, শিল্প বিপ্লব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং উপরোক্ত ব্যক্তিদের এই সব বড় বড় কথা শুনে তাঁরা ভাবেন "নাঃ এই ভদ্রলোক অনেক জানেন, বোধ হয় ঠিকই বলছেন" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো—ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলো। সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছিলো, এবং পশ্চিমী দেশগুলির যেখানে এই বিপ্লব ঘটেছিলো তাদের সামনে ছিলো পণ্য বিক্রির জন্য বিস্তীর্ণ বাজার—নিজের দেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে। পাশাপাশি আসুন আজকের অবস্থাটা দেখি—এম আই. টির (M. I. T.) (U. S.) এক বিশিষ্ট অধ্যাপকের মতে "The problem we are facing today is not how to produce more, but where to sell more". এবং এই বিক্রির সমস্যা যতো বাড়বে ততো মানুষ ছাঁটাই হবে। এবং স্বাভাবিকভাবেই বাজার আরও ছোটো হবে।

তাই আজ সবথেকে বড় প্রশ্ন হলো—আমরা কি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক চমকপ্রদ আবিষ্কার কম্পিউটারের বিরোধীতা করবো? তাহলে কি আমরা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জোয়ারের মুখে বাঁধ বানাবো? এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো খুবই সহজ—একটি ধারালো ছুরি যেমন কুশলী শল্যবীদের হাতে পড়লে একটি মৃতপ্রায় রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারে আবার সেই একই ছুরি একজন হাতুড়ের হাতে পড়লে সুস্থ রুগীর প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। এই বিষয়ে ছুরিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কথাটা হচ্ছে ব্যবহার করবে কে? কম্পিউটার বা অটোমেশনের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যখন এই কম্পিউটারই মাঠের চাষীর থেকে স্কুলের ছাত্রর কাজে লাগছে তখন সামন্ততান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ওই কম্পিউটারের জন্য মানুষ চাকরী হারাচ্ছেন।

তাই যতক্ষণ না এই অন্ধকার, বিষাক্ত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটছে, এই মারাত্মক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

"আজকের মতো বলো সবাই মিলে
যারা এতদিন মরে ছিলো তারা উঠুক বেঁচে
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক এবার মাথা তুলে"

—রবীন্দ্রনাথ

ঐতিহাসিক মে দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন

—প্রিয়জিৎ ব্যানার্জী

"দুনিয়ার মজদুর এক হও—"

দেশ, কাল আর জাতির সীমাকে অতিক্রম করে যে দিনটি আজ দুনিয়ার প্রতিটি শ্রমজীবী পরিবারের নিজস্ব উৎসবে পরিণত হয়েছে সেটিই হল পয়লা মে। স্তালিন ১৯১২ সালে মে দিবসের ইস্তাহার লিখেছিলেন, "প্রতিটি শ্রেণীরই নিজ নিজ প্রিয় উৎসব রয়েছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের উৎসব প্রচলন করেছিলো এবং সেই উৎসব উপলক্ষ্যে তারা কৃষকদের লুণ্ঠন করায় তাদের 'অধিকারের' কথা ঘোষিত হত। বুর্জোয়াদেরও নিজস্ব উৎসব আছে আর তার মধ্যে দিয়ে তারা শ্রমিকদের শোষণ করায়, তাদের অধিকারের ন্যায় সঙ্গতাই প্রকাশ পায়। যাজক সম্প্রদায়েরও নিজস্ব উৎসব রয়েছে যার মাধ্যমে তারা, যে ব্যবস্থায় শ্রমজীবি মেহনতী মানুষকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয় অথচ অলস লোকেরা বিলাসিতায় গা ঢেলে দেয়, প্রচলিত সেই ব্যবস্থাটির জয়ধ্বনিই দিয়ে থাকে।" স্তালিনের এই মন্তব্যে সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণী অনুভব করে যে তাদেরও চাই নিজেদের উৎসব, যেদিন তারা ঘোষণা করবে, সার্বজনীন শ্রম, সর্বজনীন স্বাধীনতা, সকল মানুষের সর্বজনীন সাম্য। এই উৎসবই হল পয়লা মে দিবসের উৎসব। এই উৎসব পালনের অধিকার তাদের কেউ দেয় নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে, প্রচুর রক্ত ঝরিয়ে, অমানুষিক বর্বর অত্যাচার সহ্য করে তারা এই উৎসব পালনের অধিকার অর্জন করেছে, ছিনিয়ে এনেছে নিজেদের জয়। তাই এই উৎসব এত আনন্দের, এত বেশী গর্বের, এত বেশী আপনার।

মে দিবস শতবার্ষিকী আজ বিপুলভাবে সমাদৃত। আমেরিকার মালিকশ্রেণী বহু বাধা, বহু অত্যাচার করেও শ্রমিক আন্দোলনকে আটকাতে পারেনি। অবশেষে তারা হার স্বীকার করেছেন। আমেরিকার A. F. L ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল যে ১৮৯০ সাল থেকে প্রতিবছর পয়লা মে '৮ ঘন্টা কাজের দিন' হিসাবে চালু হবে। কিন্তু এই বাধ্যতার পিছনে যে করুন কাহিনী, যে প্রচণ্ড সংগ্রামের বাণী লুকিয়ে আছে, তা এর থেকেও বেশী সমাদৃত। এই দিনটিকে চালু করতে অগণিত মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর উপর দিয়ে বয়েছিলো অত্যাচারের প্রবল ঝড়। ১৮৬৬ থেকে ১৮৮৬, এই বিশ বছর ধরে শ্রমিক আন্দোলনকে অনেক প্রতিকূলতা, হত্যা, আক্রমণের মুখোমুখী হতে হয়েছে। ১৮৭১ সালে প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠার কমিউনার্ডদের বর্বরভাবে গণহত্যার বিরুদ্ধে ইউরোপের দেশে দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৮৭৬ সালে এই সংস্থা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন থেমে থাকেনি। ১৮৮৪ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার

কংগ্রেস অব দি ফেডারেশন অব অর্গানাইজড ট্রেডস অ্যান্ড লেবার ইউনিটের চতুর্থ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৮৬-র পয়লা মে, শনিবার, ধনবাদী সভ্যতার অবারিত শোষণের প্রতিবাদে এবং ৮ ঘণ্টার বেশী ফ্যাক্টরীতে না খাটার দাবীতে শিকাগোর ৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট ঘোষণা করেন আর মিছিলে যোগ দেন অযুত শ্রমিক। ধর্মঘট ভাঙা দালাল দিয়ে ম্যাককর্ণিক ফ্যাক্টরী চালু রাখার চেষ্টায় বাধা দিলে ৪ঠা মে হে-মার্কেটের (Hay market) প্রতিবাদ সভায় প্রায় মধ্যরাতের চোরা আক্রমণে একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে মারা যান আর নিহত হন পুলিশ অফিসার দেগান। শহরে জনসভা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সিটিকাউনসিল হুকুম জারী করে শিকাগোর পথঘাট থেকে লাল রঙ, যা শ্রমিক আন্দোলনের রঙ, তাকে পুরোপুরি মুছে দিতে। শহর জুড়ে পুলিসি ধরপাকড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। সংঘর্ষে ৭ জন পুলিশ ও ৪ জন শ্রমিক নেতার মৃত্যু হয়। কিন্তু এত অল্প রক্ত সরকার সন্তুষ্ট হল না। সংগ্রামী শ্রমিক নেতা পার্সনস, স্প্রীজ, ফিসার, এঙ্গেলের বিরুদ্ধে মামলা সাজিয়ে তাদের ফাঁসি দেওয়া হল, আর শিকাগোর অন্যান্য জঙ্গী নেতাদের দণ্ডিত করা হয় দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডে। শোষণমাত্রা সীমিত করণের এবং ৮ ঘণ্টা কাজের দাবী করার অপরাধে পুঁজিবাদী ন্যায়-নীতি চার শ্রমিক নেতার প্রাণ দাবি করল, আর এভাবেই সংস্থাপিত হল মে দিবসের সংগ্রামী ঐতিহ্য, বিপ্লবী আত্মত্যাগের ঐতিহ্য। ফাঁসির দড়ি গলায় পরেও পার্সনস দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "জনগণের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করা যাবে না।"

১৮৯১ সালে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পরবর্তী কংগ্রেসে মে দিবস পালন এবং ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির আওয়াজ তোলার পুনরাহ্বান জানানো হয় এবং সাথে সাথে জাতি-সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি সুনিশ্চিত করার আহ্বানও রাখা হয়। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল কারণ এটা বাদ দিলে শ্রমিকশ্রেণীর সংহতি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছিল, যেখানে সম্ভব সেখানেই ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে মে দিবস পালন করতে হবে। এঙ্গেলস্ এই আহ্বানের গুরুত্ব অনুভব করে লিখেছিলেন, "আজ আমেরিকা এবং ইউরোপের সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী তাদের নিজস্ব শক্তির পরিমাপে নিয়োজিত। এই প্রথম তারা একই পতাকার নীচে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের আশু দাবী ৮ ঘণ্টা কাজের সময়কে আইনসিদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। যে দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে নিঃসন্দেহে সর্বদেশের পুঁজিপতি এবং ভূস্বামীরা অনুধাবন করেছে যে আজ সর্বদেশের শ্রমিক-শ্রেণী প্রকৃতই ঐক্যবদ্ধ।" এঙ্গেলসের এই রচনা যে শুধু কথার কথা নয় তা বারংবার প্রমানিত হয়েছে। লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে ১৯১৭-র বিপ্লব ছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিরাট আঘাত। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক মেহনতী মানুষের সমর্থনে পুষ্ট এক নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান বিজয়, যাতে শ্রমিকশ্রেণীর, লালফৌজের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে আর একটি বড় আঘাত হানে। মহান চীন বিপ্লবের বিজয়, ইউরোপের বহু দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়, কিউবা এবং কোরিয়ার বিপ্লবের বিজয় এবং অদ্বিতীয় ভিয়েতনাম বিপ্লবের বিজয় ছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে সঙ্কল্পবদ্ধ বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রত্যক্ষ ফসল।

মে দিবসের রক্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের জমিকে উর্বর করেছিল, উত্তাল আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে দিয়েছিল চতুর্দিকে। সেই সংগ্রামের ফসল হল একের পর এক বিজয়, যা আজও অপ্রতিহত। আজ এই শতবর্ষের দ্বারে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নব নব সাফল্যের ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়িয়ে আমরাও আমাদের দেশে মে দিবস উদ্‌যাপন করছি। কিন্তু এদেশে এখনো পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হয়নি, প্রতিষ্ঠিত হয়নি সর্বহারার রাষ্ট্রব্যবস্থা। আজও এদেশের শ্রমজীবি মানুষ পুঁজির নিগড়ে বাঁধা, অবর্ণনীয় শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত। দুনিয়া জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য যত বেড়েছে পুঁজিবাদের নাভিশ্বাসও ততই প্রকট হয়েছে। আজ পুঁজিবাদ এক গভীর সংকটের আবর্তে। এই সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদ, জমিদারী ব্যবস্থার সাথে গাঁটছড়া বেঁধে টিকে থাকার এক মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর এটি করতে গিয়ে সমগ্র সমাজজীবনে নেমে এসেছে এক ভয়াবহ দুর্যোগ। সঙ্কটের বোঝা শ্রমজীবি মানুষের ঘাড়ে চাপানো এক হীন প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে শাসকশ্রেণী। দারিদ্র, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, শিল্প কারখানার স্থায়ী মন্দা এবং ধর্মঘট, অর্থনৈতিক জীবনে নিয়ে এসেছে বিপর্যয়। এই পরিস্থিতিতে মুনাফা, আরও মুনাফার লালসায় শ্রমজীবি মানুষের উপরে বড় বড় পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থে নতুন নতুন আক্রমন নেমে এসেছে। একদিকে এই স্বৈরাচারী পদক্ষেপ আর অন্য দিকে চলেছে শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যকে ভেঙে ফেলার হীন প্রচেষ্টা। "শ্রমিকশ্রেণীর অনৈক্য এবং অজ্ঞতাই শাসকশ্রেণীর টিকে থাকার মূলভিত্তি"—লেনিনের এই ঐতিহাসিক বক্তব্যের যথার্থতা আমাদের দেশের দিকে তাকালে অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। সামন্তযুগীয় ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করে, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে, একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতিগুলির অসম বিকাশের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জাতিগুলির স্বাধিকারের উপর ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করে আজ সারা দেশের শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যকে, তাদের স্বপ্নকে, ভাঙার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে শাসকশ্রেণী। আর এই চক্রান্তে মদত দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যারা আমাদের দেশকে দুর্বল করতে চায়। তারা আমাদের তাদের উপরে নির্ভরশীল করে তুলতে চাইছে, যাতে তারা অবাধে তাদের লুঠের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করতে পারে। আজ আমাদের দেশে শ্রমজীবি মানুষের অনৈক্য তাদের কাজকে আরও সহজ করে দিচ্ছে। জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে শ্রমজীবি মানুষ। এর ফলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আমাদের শ্রমিকদের আন্দালন দুর্বল হয়ে পড়ছে। বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে, দুর্বিসহ সঙ্কটের প্রতিকারে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার হল ঐক্য। এই ঐক্য আমাদের অর্জন করতে হবে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই ঐক্যের চেতনাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। সকলের সমান অধিকার, সমান মর্যাদার মধ্যে দিয়েই এই ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিভেদ জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে নয়—বিভেদ হল শোষকে আর শোষিতে, এই চেতনায় শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। বুর্জোয়ারা এই ঐক্যকে ভয় পায় কারণ এ ঐক্য তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন

করতে পারে। আমাদের দেশের মে দিবসের শতবর্ষ তাই বর্তমান পটভূমিতে এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান নিয়ে শতবর্ষ আগে, মে দিবসে, যাত্রা শুরু করেছিলো। আজও সেই যাত্রা একই আহ্বানের সাথে বর্তমান। এদেশের বুকে যদি পুঁজিবাদী—সামন্তবাদী— সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটাতে হয় তবে এই মুহূর্তে আমাদের এ কাজে অগ্রসর হবার প্রাথমিক শর্ত হলো শ্রমজীবি মানুষের ঐক্য। আজ এই মুহূর্তে লেনিনের ১৯০৫ সালের 'মে দিবসের ইস্তাহারের' সেই ডাকই হোক আমাদের আজকের শ্লোগান,— "জাতিগত, ধর্মগত বিভেদ নিপাত যাক। এই বিভেদে কেবলমাত্র দস্যু আর লুঠেরারাই লাভবান হয়— যারা সর্বহারার অনৈক্য ও অজ্ঞতার জন্য টিকে আছে।"

প্রতিটি মে দিবসই নতুন সংগ্রামের বার্তা বহন করে। প্রতি মে দিবস চেতনার মান শানিত করে, শ্রমিক শ্রেণীকে আরও একধাপ এগিয়ে দেয়। গত একশ বছরে পৃথিবীর রূপ বিপুলভাবে বদলেছে। এখন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত, মুক্ত মালিকশ্রেণীর লুঠেরা হাতের নিষ্ঠুর চতুরতা থেকে, মুক্ত রাষ্ট্রজন্ত্রের দংশন আর মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের বর্বরতা থেকে। আজকের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী উৎসবে, আনন্দে নব-বিজয়ের অভিযানে উচ্ছল। গত এক শতাব্দী ধরে প্রতিবছর সারা বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষ রাস্তায় নেমে এসে সেই শিকাগো শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে, যারা মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি করেছিলেন, যারা শ্রমজীবি মানুষের ক্ষেত্রে কোনরূপ দ্বিধা-দন্দ্ব মেনে নিতে অস্বীকার করায় পুলিশবাহিনীর বুলেটে প্রাণ হারান। তারা সেই শিকাগো-শহীদের নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের প্রদর্শিত সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যারা মে দিবসের নৃশংস অন্যায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে ফাঁসিকাঠে মাথা উচু করে এগিয়ে গেছিলেন। মে দিবস আজ শতবর্ষের আলোয় উদ্ভাসিত। শতবর্ষের মে দিবস বার্তা বহন করছে নতুনের, আহ্বান জানিয়েছে যুদ্ধের বিভীষিকা মুক্ত শান্তির পৃথিবীর ; বিভেদ আর বিচ্ছিন্নতার কুৎসিৎ সঙ্কীর্ণতা ধ্বংস করে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের আন্দোলন প্রসারিত করার। মে দিবসের শতবর্ষের আলোয় দাঁড়িয়ে আজ শ্রমিকশ্রেণী শপথ নিচ্ছেন,—সারা দুনিয়াকে শোষণ মুক্ত করে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন কায়েম করার, দুনিয়াকে বদলে দেওয়ার সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোলচর্ম সাম্রাজ্যবাদের উদ্যত থাবাকে ধ্বংস করার। আজ তারা শপথ নিচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া শান্তি আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এখানেই মে দিবসের সাফল্য, এখানেই সার্থক যুগ যুগ ধরে শহীদদের রক্ত দেওয়া।

"শতাব্দির সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ঙ্করী"

—রবীন্দ্রনাথ

ইতিহাসের আলোকে নয়াজাতীয় শিক্ষানীতি

—উত্তর সারথি গুহমজুমদার

স্বাধীনতার পরে প্রায় চার দশক অতিক্রান্ত। 'মধ্যরাত্রির সন্তানরা' প্রায় বার্দ্ধক্যে উপনীত, নতুন আর এক প্রজন্ম যৌবনের পথে। তারই মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা। একটা দেশের শিক্ষানীতি নিয়ে চিন্তাভাবনার আগে বুঝে নেওয়া দরকার 'শিক্ষা' কি এবং কি তার গুরুত্ব আমাদের সমাজে।

হাজার হাজার বছর ধরে কাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সারবস্তু হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের দক্ষতা বাড়ায়। এই দক্ষতা মানুষ ব্যবহার করে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার কাজে। মানুষ আগে পরিবর্তন করেছে এবং তারপর তার ব্যাখ্যা করেছে। পরিবর্তন না করলে মানুষ বাঁচতে পারে না। পরিবর্তন করতে গিয়ে সে শ্রম দিচ্ছে। শ্রম দিতে গিয়ে হচ্ছে "অভিজ্ঞতা" অবশ্য শ্রেণীভিত্তিক সমাজের জন্মলগ্ন থেকেই "অভিজ্ঞতার" একটা তত্ত্বগত বা দার্শনিক দিক থাকে। এর ফলেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর হয়ে দাঁড়ায়। আবার শিক্ষার ধারাবাহিকতাও আছে—একটা বৈজ্ঞানিক দিক। শিক্ষা মানুষকে পৃথিবী সম্পর্কে একটা ধারণা গড়তে সাহায্য করে। শিক্ষা আমাদের দেয় কাজের দক্ষতা। তাই কাজ থেকে আলাদা হলে শিক্ষার ফল পুণ্য। একমাত্র শিক্ষাই পরিবেশ পরিস্থিতিকে জানতে শেখায়। শিক্ষা সমাজকে চিনতে পরিবর্তন করতে শেখায়, শিক্ষা আনে মুক্তির প্রেরণা।

একটা দেশের শিক্ষানীতিকে বোঝবার জন্য রাষ্ট্রের চরিত্র জানা দরকার। ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায়, শাসকশ্রেণী তার নিয়ন্ত্রণকে প্রসারিত করে সমাজের সর্বস্তরে অর্থাৎ কিনা উপরি-কাঠামোর। তারা সর্বদাই দেশের শিক্ষা সাংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে তাদের শ্রেণী মতবাদের সাহায্যে। শিক্ষা কতখানি প্রসারিত হবে, কি ধরণের হবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থায়, তা নির্ভর করে শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনীয়তার উপর। বিখ্যাত রুশ শিক্ষাবিদের শিক্ষাসম্পর্কিত মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"In my opinion education is the definite Purposefull, systematic influencing of the mind, of the person being educated, with qualities as desired by the educater"—Kalinin.

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে শাসকশ্রেণী অতন্ত্র সচেতনভাবে তার শ্রেণীগত স্বার্থে শিক্ষার ধারণার সৃষ্টি করে এবং প্রচার করে থাকে। নিরপেক্ষ শিক্ষার কোন অস্তিত্ব এর ফলে লিখিত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

ইংল্যাণ্ডের উপযোগবাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট লর্ড বেনটিক ভারতবর্ষের বুকে প্রথম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের চিন্তাভাবনা করেন। সরকার চালানোর খরচ বেড়ে যাওয়ায় ইংরেজের প্রয়োজন ছিল খুব অল্প পয়সায় পাওয়া একদল কেরানীর ধারাবাহিক সরবরাহ। ইংরেজের আগমন ভারতের সনাতন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ও ঔপনিবেশিক স্বার্থেই গড়ে উঠে একটা ভীমতর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইংরেজি ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় টোল, মাদ্রাসার মত সনাতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়। গণশিক্ষা প্রসার এর ফলে ব্যহত হয়। নিরক্ষরতা বাড়তে থাকে মাতৃভাষার বদলে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় এবং ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত ব্যয় বহুল হওয়ায়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চবিত্ত শহরবাসীদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার আগে মুল দ্বন্দ্বটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ বনাম দেশীয় পুঁজিবাদের। তাই ইংরেজ প্রবর্তিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার গলদগুলো জাতীয়তাবাদীদের অজানা ছিল না। এলাহাবাদে ১৮৮৮ সালে, কংগ্রেস অধিবেসনে শিক্ষাসংক্রান্ত বক্তব্যে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। লর্ড কার্জনের আমলে ব্রিটিশবিরোধি গণআন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বদেশী চেতনা বাড়তে থাকে। কার্জন, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের নেতৃত্বে একটা শিক্ষাকমিশন বসান। এই কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরী হয়। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি সাহায্য কমিয়ে দেওয়া হয় এবং শিক্ষার মান উন্নোয়নের নামে শিক্ষার প্রসার রোধ করার চেষ্টা হয়। জাতীয়তাবাদীরা সরকারি সিদ্ধান্তের মৌখিক প্রতিবাদ জানান ১৯০৪ সালে বম্বেতে কংগ্রেস সম্মেলনে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি জানানো হয়। ১৯০৬ সালে কলকাতা সম্মেলনে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবীতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্বাধীনতার আগে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে একটা কমিটি গান্ধীজির অনুরোধে করা হয়। এই কমিটি নেতৃত্ব দেন ডাঃ জাকির হোসেন এই কমিটি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করে—

১। সাত থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
২। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে এই সুপারিশগুলো গ্রহণ করা হয়।

স্বাধীনতার পর দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ কিনা কাঠামোয় পরিবর্তন আসে। ভারতবর্ষের দেশীয় পুঁজিপতিরা নিজেদের শ্রেণী নিয়ন্ত্রণকে সুদৃঢ় করার জন্য নব্য স্বাধীন দেশের উন্নয়নকে পুঁজিবাদী পথে পরিচালিত করতে চায়। কিন্তু পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ না করে বরং তার সঙ্গে আপস করে দেশীয় পুঁজিপতিরা। স্বাধীন ভারত আত্মপ্রকাশ করে একচেটিয়া পুঁজির নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র হিসেবে। ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ সালে স্বাধীন

ভারতের সংবিধান প্রকাশ করা হয়। কিন্তু শিক্ষার অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী। মৌলিক অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করলে সে আদালতে গিয়ে বিচার চাইতে পারে। শিক্ষাকে রাখা হয় রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশাত্মক নীতিগুলোর (Directive Principles of the State Policy) মধ্যে রাখা হয়। নির্দেশাত্মক নীতিগুলো আদালত কর্তৃক রক্ষিত নয়। এর ফলে যদি কাউকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায় শাসকশ্রেণী তাহলে বিচার প্রার্থনা করতে আদালতে যাওয়ার পথ বন্ধ। এর থেকে এটা পরিষ্কার যে ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী কোনদিনই নিরক্ষরতা দূরিকরণের ব্যাপারে কোন দায়বদ্ধতার মধ্যে যেতে চায়নি। যদিও দেশের নিরক্ষতা ১৯৬০ সালের মধ্যেই দূর করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

স্বাধীনতার পর প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয় ব্যাপক শিল্পায়ণের উপর। জাতীয় বুর্জোয়ারা দেশের অভ্যন্তরীন বাজারটা নিজেদের দখলে রাখতে চেয়েছিল। এর ফলে প্রচুর শিক্ষিত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর প্রথম যে দুটো শিক্ষাকমিশন নিয়োগ করা হয় তা হল রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ও মুদালিয়ার কমিশন। এদের সুপারিশগুলো ভারতের উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই করা হয়েছিলো। এই সময়ে দেশে প্রচুর স্কুল ও কারিগরী মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠে। কিন্তু অবহেলিত হয় গ্রামগুলি, সেখানে শিক্ষাপ্রসার বাহত হয় সামন্তপ্রভুদের আপত্তির জন্য কিন্তু মাত্র দশ বছরের মধ্যেই দেখা গেল যে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার সেভাবে বাড়েনি, বাড়েনি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। ব্যাপক ভূমিসংস্কার প্রয়োজন ছিল এই সংকট কাটিয়ে উঠতে, কিন্তু তা করতে গেলে গ্রামে সামন্তপ্রভুদের উচ্ছেদ করতে হয়। সেটা ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ গ্রামভিত্তিক দেশ-ভারতবর্ষে নির্বাচনের সময় ক্ষমতা ও অর্থ বলের সাহায্যে এরাই শাসকদল কংগ্রেসকে কেন্দ্রের ক্ষমতা হাতে রাখতে সাহায্য করত। ষাটের দশকের প্রথম দিকে এসেই শাষকশ্রেণী বুঝতে পারল, যে ভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে তাতে অচিরেই শিক্ষিত বেকারদের হতাশা বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। শিক্ষাসংকোচনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নিযুক্ত হল কোঠারি কমিশন ১৯৬৪ সালে এবং ১৯৬৬ সালে তার রিপোর্ট প্রকাশ হয়। এই রিপোর্টে যেমন সাধারণ মানুষের আশাআকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছু সুপারিশ ছিল তেমনি অন্য দিকে শাসকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থবাহী সুপারিশগুলো যেমন ত্রিভাষানীতি, আদর্শ উচ্চশিক্ষায়তন প্রভৃতি শুধুমাত্র কার্যকর করার কথা বলা হল।

১৯৮৪ সালে রাজিব সরকার গঠন হবার পর নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা Challenge Education নামক গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ করে। বলা হয়েছে ১৯৯০ সালের মধ্যে ১৫ ৩৫ বছরের সকলকে স্বাক্ষর করা হবে। সর্বোরোগের মহৌষধী "প্রথামুক্ত" শিক্ষা দিয়ে। প্রথামুক্ত শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক স্তরেও করা হবে, অথচ "১১ বছর পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে

রাখবার কথাই বিশেজ্ঞরা বলে থাকেন।" (অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, উল্লিখিত মন্তব্যটি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি কোন পথে' নামক পুস্তিকায়)

১৯৮০—৯০ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আশা করা হচ্ছে ২.৫% মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে। এই হিসেব অনুযায়ী বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রায় ৬০ মিলিয়ন শিশু স্কুল ব্যবস্থার বাইরেই রয়ে যাবে। এই বিপুল সংখ্যক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে প্রথামুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে বলা হচ্ছে, কিন্তু এটাও বলা হচ্ছে যে the number of children to be Coneved in the non formal programme is reckomend to be of the order of 25 million. (Seventh Five Year Plan, Vol. II P. 256, Para: 10.26)

তাহলে বাকীরা যাবে কোথায় ? স্বাধীনতার আগে এবং পরে জাতীতাবাদী নেতাদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে, জনসংখ্যাকে উৎপাদনি সম্ভাবনাপূর্ণ সম্পদরূপে মামুলি ঘোষণার আড়ালে তাদের জন্য তৈরি হচ্ছে বঞ্চনা।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ স্কুলেই শিক্ষার ন্যুনতম সুযোগ সুবিধাগুলো মেলেনা। Challange of Education (Para. 3·7)এ নগ্ন স্বীকারোক্তি দেশের বসতি এলাকার এক পঞ্চমাংশে কোন স্কুল নেই। বাকী অংশের ৪০% কোন পাকা বাড়ী নেই, ৩৯·৭২% স্কুলে ব্লাকবোর্ড নেই, ৫৯·৫% স্কুলে পানীয় জল নেই আর ৩৫% স্কুলে মাত্র একজন করে শিক্ষক আছেন। এই অসুবিধাগুলো দূর করার বদলে মডেল স্কুলের কথা বলা হয়েছে মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য। মডেল স্কুলে শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে আঘাত করে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে গণিত ও বিজ্ঞানের জন্য ইংরেজি। সমাজবিজ্ঞানের জন্য হিন্দী, ভাষা সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তটি সবকটি শিক্ষক-মিশনের অভিমত বিরোধি। কলকাতায় ১৯৮৫ সালের রিজিওন্যাল সেমিনারে NCERT'র প্রতিনিধি প্রতিবেশ স্কুলের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। মডেল স্কুলে এমনকিছু 'তোতাপাখি' তৈরী হবে যাদের যাদের কোন সমাজবোধ থাকবে না, এক্ষণে সৃষ্টি হবে একদল উদ্ভাসিক মানুষ যাদের সঙ্গে বাস্তব জীবনের ব্যবধান হবে দুস্তর। এই প্রসঙ্গে লর্ড মেকলের সেই উক্তিটি মনে পড়ে।

"We must (at) present do our best to form a Class who may be inter preters neturer between us and the millions whom we "govern ; a class of Persons, Indians in blood and Colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect."

(Quoted by Bipin Chandra in his bok Modern India) অন্যদিকে সাধারণ স্কুলগুলোর সরকারি সাহায্য কমে যাচ্ছে এবং এই স্কুলগুলোর উন্নতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই।

উচ্চশিক্ষায় যে সব সুপারিশ করা হয়েছে তাতে এই শিক্ষানীতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য উচ্চ শিক্ষাকে সংকুচিত করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে দেশে উচ্চ শিক্ষার নাকি যথেষ্ট প্রসার হয়েছে আর প্রসার নয়। অথচ পাশাপাশি খসড়ায় স্বীকার করা হয়েছে যে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করার বয়েস হয়েছে এমন ভারতীয় ছাত্রদের মাত্র ৪.৮% কলেজে প্রবেশ করতে পাচ্ছে। সুতরাং উচ্চ শিক্ষালাভে যোগ্যতা ও আগ্রহ রয়েছে এমন ছাত্রদের জন্য যেখানে প্রয়োজনীয় উচ্চশিক্ষায়তন নেই, সেখানে উচ্চশিক্ষার প্রসার বন্ধ করা হচ্ছে মানোন্নয়নের নামে। সরকারকে উচ্চশিক্ষালাভেচ্ছুক ছাত্রদের চাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য চাকুরি থেকে ডিগ্রিকে আলাদা করবার কথা বলা হয়েছে। চাকরি পেতে যখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রয়োজন হবে না, তখন শিক্ষার মূল্যটাই আমাদের সমাজে কমে যাবে। কিন্তু অর্থে প্রশ্নটা চাকরির। যেখানে বছরের পর বছর ডিগ্রিধারি ছেলেদের চাকুরির সুযোগই কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্টি করতে পারছেন না সেখানে ডিগ্রি বাদ দিয়ে চাকরি দেবার প্রশ্রিতি এক অতি উন্নত মানের প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ব্রিটিশ আমলে শিক্ষানীতির প্রতিবাদের অগ্রভাগে ছিলেন উচ্চবিত্ত মানুষ। তার থেকে আজকের শিক্ষানীতির প্রবক্তরা এটা বুঝেছেন যে সমাজে মতামত তৈরিতে সবথেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে মধ্যবিত্ত। যে কোন ঘটনা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করে মধ্যবিত্ত। নয়া শিক্ষানীতির জনবিরোধী চরিত্র মধ্যবিত্ত তথা খেটে খাওয়া মানুষকে বিক্ষুব্ধ করবে এটা দিল্লীর শিক্ষা-দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের অজানা নয়। ছাত্রস্বার্থ পরিপন্থী এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে তারও একটা বড় অংশ আসে এই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। তাই শাসকশ্রেণী সমাজের এই সংবেদনশীল অংশটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এই নিয়ন্ত্রণ নয়াজাতীয় শিক্ষানীতির প্রনেতারা প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছেন শিক্ষায়তনের অরাজনৈতিকরণের ঘোমটা পরিয়ে বিশ্বভারতী সংশোধনী বিল, প্রভৃতির মাধ্যমে। বিশ্বভারতীর শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকরা হয়েছে এবং তথাকথিত অরাজনৈতিক মনোনীত কাউন্সিলে যাদের রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ও মমতা ব্যানার্জীর মতো একটি বিশেষ রাজনৈতিকদলের টিকিটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের।

ছাত্রদের নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় স্লোগান 'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ নয়'। সেদিন ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করতে জাতীয় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ব্রিটিশের শিক্ষানীতির ফলে ছাত্রছাত্রীরা যে আশু ও মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দূর হবে। অথচ নানা সমস্যায় ছাত্র সমাজ জর্জরিত। আসলে নয়াজাতীয় শিক্ষানীতির প্রবক্তরা বলতে চান "আমার রাজনীতি করো, ওদের রাজনীতি নয়। আমার পক্ষের রাজনীতি রাজনীতি নয়, আমার বিরোধীতা হলে সেটা রাজনীতি—যা করা চলবে না?"

এই শিক্ষানীতির আর একটি বিপদজ্জনক দিক হল অতিকেন্দ্রীকতার ঝোঁক। সত্তরকোটি মানুষের এই দেশ সেখানে বহুভাষা ও সংস্কৃতির সহাবস্থান, সেখানে সারা দেশের জন্য অভিন্ন পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে নেহেরু ও আম্বেদকর শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় রাখার কথা বলেছিলেন। সঙ্গত কারনেই শিক্ষাকে রাজ্যতালিকায় সংবিধান প্রণেতারা রেখেছিলেন। জরুরী অবস্থার সময় ১৯৭৬ সালে শিক্ষাকে যুগ্মতালিকায় নিয়ে যাওয়া হয়—অর্থাৎ কেন্দ্রের কতৃত্বে। রাজ্যগুলোর অর্থ নৈতিক ক্ষমতাগুলো অনেকদিন থেকেই কেড়ে নেওয়া শুরু হয়েছিল, বাকি ছিলো শিক্ষা। সেখানে অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড 'নামে যে অভিদানের নকসা রচিত হয়েছে তা আসলে 'অপারেশন ব্ল্যাঙ্কেট" কালো কম্বলে সবকিছু ঢেকে দেবার ফন্দি। সারা দেশে একভাষার নামে যে ভাবে হিন্দী চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে, তাতে যে জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের নামে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের আয়োজন, তা শেষ পর্যন্ত সংহতি-সংহারের কারণ হয়ে দাঁড়ালে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

শিক্ষানীতির এই জনবিরোধী চরিত্র আড়াল করতে দেশের শাসকশ্রেণী সর্বদাই সর্বহারাদের চেতনাকে বিষাক্ত করার চেষ্টা করে চলেছে দূরদর্শন, বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী বাজারি সংবাদপত্র-গুলোর মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সেই বিখ্যাত উক্তিটি।

"The point is that never at any time has the state relied on cride force alow, the principal means of suppressing the lower orders has been the sword, crude force, but alongside this have done methods of poisoning the conciousness of the lower ordirs of the society"—Lunacharusky.

এই শিক্ষানীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় কমানোর নির্দেশ। এর ফলে কলেজগুলো বিপদে পড়বে। সমাধান হিসাবে বলা হয়েছে ছাত্রবেতনবৃদ্ধি ও ভর্তির সময় এককালীন মোটা টাকা (Capitation fee) আদায়ের কথা, এর ফলে উচ্চশিক্ষা চড়া দামের পণ্যে পরিণত হবে।

দেশকে আধুনিক শিল্পোন্নত করার কথা এই শিক্ষানীতির প্রণেতারা বলেছেন, জাপান এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ, সেখানে ১৮৭০ সাল থেকেই শিক্ষা সার্বজনীন। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব থেকেই জানা যায় যে একবিংশ শতাব্দীতে ঢোকার মুখে পৃথিবীর মোট নিরক্ষরদের শতকরা ৫৪ ভাগেরই দেশ হবে ভারতবর্ষ। ভারতীয় অর্থ নীতি বিশ্বব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকারের আমলে কতখানি চলে গেছে তা বোঝা যায় যখন শিক্ষানীতিতে বলা হয় যে আর কলেজ বাড়াবার দরকার নেই। কারণ ভারতীয় অর্থ নীতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ অল্প কয়েকটি অত্যাধুনিক শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষানীতির খসড়া যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের পরামর্শ অনুযায়ী করা হয়েছে তার প্রমাণ,

"The developement of upper levels of formal education will be selective and carefully planned, taking into account the limited alsserptine capacity of the modern sector for labour, and the needs of both the public and private sectors for managerial and technical skills to meet the needs of Increasingly sophisticated economics will wave priority."

[Education sector policy paper. April 1980, p. 87]

বছর পরিবর্তে স্বল্প সংখ্যকের জন্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিন্ত করাই হবে নতুন শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট। ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে ব্রিটিশ সরকার তার রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যই শিক্ষাসংকোচনের প্রস্তাব করেছি। ভারতবর্ষের বর্তমান শাসকশ্রেণী নিজেদের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে দেখে একই দৃষ্টিকোণ থেকে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেছেন। তাই ভারতবর্ষের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে শত শত 'একলব্য' আজ গর্জে উঠছে এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে। ইতিহাস লর্ড কার্জন, লর্ড মেকলেকে ক্ষমা করেনি, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির প্রণেতারাও পার পাবেন না। কারণ শিক্ষা ছাড়া বাঁচার অস্তিত্বে টান পড়ে।

"শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে ব্যাথা কি আমি জীবনে মরণে
কখন ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।"

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

ছাত্র সংসদের সভাপতি

—অধ্যাপক সজল ভট্টাচার্য

ছাত্রছাত্রীদের সৃজনক্ষমতার প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল আশুতোষ কলেজের মুখপাত্র এবারও আত্ম-প্রকাশ করল সঠিক সময়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতির এই প্রকাশ কলেজের সর্বস্তরের প্রশংসা অর্জন করবে বলে আশা রাখি।

ছাত্রসংসদ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত করতে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে। আগামী দিনে যারা সমাজের নানা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন, আজকের সেই ছাত্রছাত্রীরা সমাজের নানা সমস্যা সম্পর্কে যাতে সচেতন হন, বিভিন্ন বিষয়ে ভাবতে পারেন এবং সংগঠিত কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হন—এই উদ্দেশ্যেই আমরা ছাত্র সংসদের ভূমিকাকে স্বাগত জানাই। আমাদের কলেজের শিক্ষার পরিবেশ ক্রমশই উন্নত হচ্ছে।

নবীনবরণ, বার্ষিক উৎসব, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, কমনরুম কম্পিটিশন প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমূহ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণে বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ছাত্রসংসদ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সহ আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেছে। কলেজের সকলের সহযোগিতায় নতুন ভবন শুরুর কাজ কিছুটা এগিয়েছে।

পরিশেষে আশা করব, পরের ছাত্রসংসদ তাদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে বহন করবেন এবং কলেজেব সামগ্রিক উন্নয়নের এই প্রচেষ্টায় নতুন মাত্রা যোগ করবেন।

সাধারণ সম্পাদক

—উত্তরসারথি গুহ মজুমদার

১৯৮৬ পুনর্মূল্যায়ণের বছর, এগিয়ে চলার বছর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের একশ পঁচিশতম জন্মবর্ষ, মে দিবসের শতবর্ষ।

বিশ্বজুড়ে চলছে সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ যুদ্ধ চক্রান্ত, নয়া উপনিবেশবাদের রক্ত-চক্ষু, মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা। আর তারই বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে—ব্যারিকেড গড়ে উঠেছে

অত্যাচারীদের পথ রুদ্ধ করতে। লড়াই চলছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, নিকারাগুয়ার, ফিলিপিনসে, এল সালভাডোরে।

আমার দেশ ভারতবর্ষের মাটি লাল হয়ে গেছে আরও লালে, কানসারায় নিরপরাধ মানুষের রক্তে। গুজরাটে, উত্তরপ্রদেশে চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ধর্মান্ধ শক্তির সঙ্গে আপস করে ভারতীয় নারী সমাজের প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছে মুসলিম মহিলা বিলে। ছাত্র সমাজের উপর বর্বর আক্রমন হানা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে। আজ তাই সারা দেশে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। আসাম চুক্তি, মিজো চুক্তির বলে বলিয়ান সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আজ তাদের থাবা বাড়িয়েছে আমার রাজ্য পশ্চিমবাংলায়। গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের মাধ্যমে আবার বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত চলছে।

এরই মধ্যে আশুতোষ কলেজে চেষ্টা হয়েছে সীমিত ক্ষমতা সত্বেও ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াবার ছাত্রসংসদ ছাত্রসমাজের সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সংসদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৮২-৮৩তে যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল, কলেজে সর্বস্তরের সহযোগীতায় তা ধারাবাহিকভাবে বজায় রেখে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি। লাইব্রেরীতে ছুটো করে বই দেওয়া নিয়মিত করতে ছাত্র সংসদ সচেষ্ট থেকেছে। লাইব্রেরীতে কতুন বই কেনার দাবী আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। কমনরুমে ব্যাপক উন্নতিসাধন করা হয়েছে। রোয়িং-এ আমাদের কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ছাত্রসংসদের দীর্ঘ-দিনের দাবী কলেজের নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে নতুন ভবন নির্মাণে যাতে কোন বাধা না আসে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছাত্রসমাজকে রাখতে হবে। আমাদের কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের আমাদের কলেজেই ভর্তির ব্যবস্থা করেছি। সাথে সাথে অন্যান্য জায়গা থেকে ভাল নম্বর পেয়ে—আসা ছাত্রছত্রীদেরও ভর্তি করাতে বাধ্য করেছি কলেজ কর্তৃপক্ষকে।

পরিশেষে বলি সমস্যা সঙ্কুল যে সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তাতে হয়ত একটা কলেজের সমস্যার সমাধান খুব বড় একটা ধাপ নয়। কিন্তু এই ছোট ছোট ধাপ থেকেই দুর্বার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে প্রতিবাদ মিছিল। যে মিছিল সর্বহারার—সব পাওয়ার।

ক্রীড়া সম্পাদক

– রণাদেব দে

কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যশালী কলেজে, আশুতোষ কলেজের গত এক বছর ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি গর্বিত।

প্রথম থেকেই, বেশী সংখ্যক ছাত্রের অংশগ্রহণের দিকে নজর রেখে চেষ্টা করেছি পড়াশোনার পাশাপাশি কলেজের ছাত্ররা যেন একটা কিছু সৃষ্টি করতে পারে। সাফল্যের বিচার সাধারণ ছাত্ররা করবে, একমাত্র যাদের উজ্জ্বল সহযোগিতা ছাড়া এ অগ্রগতি ছিল অসম্ভব।

বিভিন্ন খেলাধূলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টার একটা সর্ব্বাঙ্গিন চিত্র নিচে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

বার্ষিক ক্রীড়া—প্রতি বছরের মত এ বছরেও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমগ্র ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্মীদের সুন্দর সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুরন্ত সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়। বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের বেতন মকুবের সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাধ্যমে আমরা ছাত্রদের অংশ-গ্রহণের স্পৃহাকে আরও বাড়াবার চেষ্টা করেছি।

ক্রিকেট—এ বছরে ক্রিকেট টিম যথেষ্ট শক্তিশালী। (যার মধ্যে বেশ কয়েকজন জুনিয়র বেঙ্গল বা প্রথম ডিভিশন লীগে খেলেন) খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখেই দল নির্ব্বাচিত হয়। প্রথম দুটি খেলার জয়ের পর অপ্রত্যাশিতভাবে দল পরাজিত হয় তৃতীয় খেলায়। তবে আমাদের মন ভাঙেনি আরও অনুশীলনের মাধ্যমে আশা করি আমরা সাফল্যের মুখ দেখবো।

রোয়িং—রোয়িং এ আমরা আবার সফল এবছর। এ বছর নিয়ে পরপর ছ'বছর আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত নকআউট টুর্ণামেণ্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এ ছাড়াও আমরা 'প্যারলে' চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। প্রতিযোগীদের রোয়িং-এর সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। সফল প্রতিযোগীদের সম্মান জানাতে দেওয়া হচ্ছে "ট্র্যাক স্যুট"।

ফুটবল—ফুটবলের শহর কলকাতা তাই ফুটবল নিয়ে আমাদের উৎসাহও বেশী। অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত হয়েছে কলেজ টীম। "হেরম্বচন্দ্র স্মৃতি শীল্ড" প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছি। আমরা এ লেখা প্রেসে পাঠানোর সময় দল সেমিফাইনালে। পাশাপাশি তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ব্যাপক অংশগ্রহনের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে শেষ হতে চলেছে আন্তঃশ্রেণী ফুটবল প্রতিযোগিতা।

শেষে জানাই এই কাজ করার পেছনে ছাত্র শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের অপূর্ব্ব সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

—দেবেশ মুখোপাধ্যায়

যুক্তমাদ রেগনসাহীর বিরুদ্ধে যখন সমগ্র পৃথিবী শপথ নিচ্ছে শান্তির তখন সেই এক আকাশের নিচে আমরা আশুতোষ কলেজে ঠিক করলাম অস্ত্র বানাবো। হ্যাঁ সেই অস্ত্রর যার প্রতিশব্দ হতে ফুল, পাখি, মেঘ, গান, কবিতা ইত্যাদি অথবা শিল্পের যে কোনো মাধ্যম। আমরা নেমেছিলাম এই প্রত্যয় নিয়ে, একটা জরাজীর্ণ মৃতপ্রায় সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে নতুন এক কৃষ্টির আশায়। অস্ত্র তৈরী হলো লড়াইয়ের সাথী পেলাম সমগ্র ছাত্র সমাজ। সহজেই গঠিত হলো "সাংস্কৃতিক উপসমিতি" উৎসাহী সৈনিকদের নিয়ে। এত উৎসাহের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলাম ৭২ থেকে ৮২-র কালো নোংরা দিনগুলিকে, যার প্রতিরোধে ছাত্রসমাজ উদগ্রীব। একদিন যে "সংস্কৃতি—৮১ শুরু হয়েছিলো শুধু দুরন্ত ভালোবাসা আর আমার আপনার বাস ভাড়া, টিফিনের পয়সায় তা আজ অগণিত ছাত্রছাত্রীর আন্তরিকতায়, অংশগ্রহণে, ভালোবাসায় হয়ে উঠেছে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তাই তো এবারের 'সংস্কৃতি -৮৬' ঘিরে এত উন্মাদনা আমরা প্রতিযোগিতার আসর সাজিয়েছি ১৩টি বিষয় সম্ভারে। চারিদিকে শরৎ রোদ্দুরের ছুটোপুটি, সবার মনের কোনে কেমন যেন এক সোনালী রঙের ছোঁয়া, সেই রঙ তুলিতে নিয়ে আমরা আয়োজন করছি 'বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের' আশাতীত এই সাফল্যের পেছনে যাঁরা আছেন সেই আশুতোষ কলেজের সমগ্র গণতন্ত্রপ্রিয়, সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে বুক বেঁধে দাড়ানোর ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নাম লিখে অপমানিত করতে চাই না। তবে আশা, যে ঐক্যের ভিত্তিতে আমাদের এই অগ্রগতি সম্ভব তা ভবিষ্যতে অটুট রেখে নতুন সূর্যের দিন আমরা ছিনিয়ে আনবোই।

কমনরুম সম্পাদক

—অরিন্দম রায়চৌধুরী

শিক্ষা এবং খেলাধুলা একে অপরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাই ক্লাসের ফাঁকে কমনরুম ছাত্রদের কাছে অপরিহার্য্য। অবিন্যস্ত একটি কমনরুমকে সঠিক উদ্যোগের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। অনেক লড়াই করে সেই কাজে আমরা সফলও হয়েছি। কমনরুমে খেলতে গিয়ে ছাত্ররা কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হত। আমরা সুষ্ঠুভাবে কতগুলো পরিকল্পনা করে তাকে বাস্তবে রূপদানের মধ্যে দিয়ে সেই অসুবিধা দূর করেছি। এছাড়া খেলাধুলার নতুন কিছু সরঞ্জাম আমরা কিনেছি এবং পুরনো সরঞ্জামগুলোকে সারিয়ে কমন-

রুমকে এক সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এক কথা আশুতোষ কলেজ কমনরুমের পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। ছাত্রদের উদ্দীপনা, সহযোগিতা ও ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবছরও আশুতোষ কলেজের বৃহৎ কমনরুম প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সংখ্যাগত দিক দিয়ে এই রকম ব্যাপক অংশগ্রহণ এই প্রথম। কলেজের কিছু বাছাই করা খেলোয়ার নিয়ে আমরা এবছর বঙ্গবাসী কলেজের "টেবিল টেনিস" প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। সাফল্য পাইনি ঠিকই তবে যে প্রচেষ্টা ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে, তাতে ভবিষ্যতে আমাদের জয় নিশ্চিত। কমনরুমে দৈনিক সংবাদপত্রের ও কিছু ম্যাগাজিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কমনরুম লাইব্রেরী চালু করার আমাদেয় দীর্ঘদিনের দাবী। শীঘ্রই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চালু করা হবে। আমাদের কমনরুম তিনটি কলেজেই ব্যবহার করে তাই কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়ই তবু সেগুলি যথাসম্ভব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা সবসময়ই করে থাকি। কমনরুমের কাজ-কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে অধ্যাপকমণ্ডলী, শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের এবং সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কমনরুম প্রতিযোগিতার সময় "কমনরুম উপসমিতি"র ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় অত্যন্ত দক্ষতা এবং পারদর্শীতার সঙ্গে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

গ্রন্থাগার সম্পাদক

—জয়দেব চট্টোপাধ্যায়

"আজকের সমাজে, গ্রন্থাগারগুলিই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়"। উক্তিটি কারো মনে না থাকলেও কলেজে পড়তে এসে এটা বুঝেছিলাম গ্রন্থাগার ছাড়া পড়াশুনা করা অসম্ভব। এবং আশ্চর্যভাবে ৮১ সাল পর্যন্ত কলেজ গ্রন্থাগারটি ছিল চূড়ান্তভাবে অবহেলিত তারপর ৮২ সালে এল সেই ঐতিহাসিক পরিবর্তন. তারপর থেকেই বিভাগটিকে সচল করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। রিডিংরুমে পর্যাপ্ত আলো পাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

কিছু বই কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব্বে বন্ধ থাকা ইংরাজী সাম্মানিক বিভাগের Seminer Library চালু করা হয়েছে। আমাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে চালু হয়েছে "বিকাশ বুক ব্যাঙ্ক" ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা ছিনিয়ে এনেছি গ্রন্থাগার থেকে দুটি করে বই দেবার দাবী। বর্ত্তমানে আমাদের দাবী ১৫ দিনের মেয়াদে দুটি করে বই দিতে হবে। এ দাবী আশুতোষ কলেজের প্রতিটি ছাত্রের এবং এ দাবীতে আমরা অবিচল থাকবোই, জয় আমাদের নিশ্চিত।

ছাত্রাবাস সম্পাদক

—রজত দত্ত

আবাসিক ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং ছাত্র সংসদের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে কলেজের ছাত্রাবাস ছুটির বেশ কিছু সমস্যারই সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। সমস্যা আরও আছে—সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে তা পৃথক নয়। আবাসিক ছাত্রদের বেশ কিছু দাবী আছে, ছাত্র সংসদ দাবীগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল। সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় আগামী দিনেতে আমরা এগিয়ে চলবো এবং সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবো। এটি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

ক্যান্টিন সম্পাদক

—দেবব্রত মজুমদার

৮২ সালের অক্টোবর মাস। আশুতোষ কলেজের ছাত্রসমাজ অন্ধকারের দিন ছেড়ে লাল প্রভাতে প্রবেশ করেছে। ছাত্ররা উদ্বিগ্ন চোখে, অনেক আশায় বুক বেঁধে ছাত্র সংসদের দিকে চেয়ে। বন্ধ হওয়া ক্যান্টিন খুলল, টেবিলের জমা ধুলো পরিষ্কার হল। সেই থেকে এখন ক্যান্টিনের টেবিলে বসে এই Report লেখা পর্যন্ত ক্যান্টিন চলেছে। এবছর গরমের ছুটির পর, দিন পনেরর জন্য ছাড়া অত্যন্ত নিয়ম মাফিক ভাবে ক্যান্টিন চলেছে, আমাদের দাবী ক্যান্টিনে "ডে-মিল' এবং পর্যাপ্ত টেবিল, পাখার ব্যবস্থার দাবীতে আমরা অটল। ছাত্রদের শুধুমাত্র সহযোগিতা নয়, সম্পূর্ণ অংশগ্রহণে এ দাবীর আন্দোলন সফল হবে না কি?

কমনরুম (মহিলা) সম্পাদিকা

—মৌসুমী রায়চৌধুরী

আমাদের কলেজে মেয়েরাও খেলাধুলা সম্পর্কে খুব আগ্রহী। তাদের জন্য নতুন করে আমরা এই মহিলা কমনরুম চালু করেছি। এতে আমরা বিভিন্ন Indoor games যেমন লুডো, দাবা, ব্যেগাডুলি ইত্যাদি চালু করেছি। আমরা একটা ক্যারাম বোর্ডের ব্যবস্থা করছি। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবী যে এই সব খেলাধূলার সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য একজন অশিক্ষক কর্মচারীকে নিযুক্ত করতে হবে। আগামী দিনে আমাদের এই দাবী কর্তৃপক্ষ পূরণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

অঙ্গীকার

—সারঙ্গরব বসু মজুমদার

আমার ঘুম কেড়ে নেয়
দুর্বোধ্য অন্ধকার .....
চোখ খোলা স্বপ্নে
অগণিত মানুষের কঠোর নিশ্বাস
আর ক্ষুধার্ত শ্বাপদের চাউনি
মৌন মূক অবস্থানের দৃঢ় অঙ্গীকার,
তাই ওদের সূর্যকে ওরা গড়ে নিতে চায়
নির্নিমেষ অন্ধকারে।

উনিশশো ছিয়াশির প্রতি

—শুভদীপ প্রামাণিক

রুক্ষ ধূ ধূ প্রস্তরের বুকে
একটু সবুজের ছোঁয়া, হয়তো বা কচি ঘাস
একটু আশার আলো? কে জানে—
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের ভূতগুলো
ছুটে বেড়াচ্ছে উন্মাদের মতো
রুক্ষ উত্তপ্ত প্রান্তরে—
ওদের থামাবার মতো ওঝারা আজ কোথায়?
নেই, কেউ নেই।
যারা আছে কেউ বৃদ্ধ
কেউ বা শিশু।
তাই ভরসা কেবল বিবেকের উপর
যা সম্পদ কেবল মানুষের—যারা সভ্য,
হয়তো ঐ ঘাসই ভরে তুলবে প্রান্তর
সবুজ রঙে রাঙিয়ে দেবে—
ছোট হলেও ওরাই প্রাণের প্রতীক
ওরাই তো বেঁচে থাকার জীবন্ত আশ্বাস।

THE WAYFAVER

—Ashish Das

Who art you, oh stranger,
From whose lips no words flow forth ?
Who art you, oh enigma,
Who enthralls me with your appearance ?
What depths have you, what secrets ?
I do not seem to fathom.

No human soul knows where from you come,
and what would be your deslihy.
Who art you, oh molecular complex.
The mass of super-intelligence which you are,
Minol-boggling, yet sciwtillating.
I hanker to know the secrets—
The secrets you've come to unravel.
From with-in the black hole you have surfaced
To refuel from the sun
And then on course for Canis Major.
You are a masterpiece.
Quite unlike
The politicians, the bureancrats and the researchers
of Earth.

But the ruthless chains of Mankind
Mane fettened me and kept me away
From comprehending you.
Yet, I will wait
Till you volunteer to unleash
These strangling chains,
And take me to the greater depths
of your bizzarre, esoteric circuits.

Life We Have Been Long Togather

—Jaydeep Mukherjee

Life, we have been long togather ;
Such glorious times we had.

But thou art just a kept,
While on my side, Death, my wife,
Wept,
Wetting my lips with her tears.

Like a mother you cared for me,
Decked up like a prostitute
You held me to thee
But no more, Oh ! —No more.

I'm a home loving man,
That palace is my home.

I'll watch thee entice others
From my dome.

Those who want to go
Come with me,
Those who want to reach,
See them, and laugh with glee
Cause they are the new customers
In your whore house.

The Hurdle of Language in India : A Suggestive Appraisal

—Amit Mittra

The subject is quite hackneyed if not ancient in character. The question of medium of instruction or communication in the broader sense has been much talked about and deliberated upon. But what makes this issue more important than a few others is the fact that far too much has been said about it than done. (Thus, the acuteness of the problem has been augmented manifold with the fruitless passage of time.) Today, it should be the duty of one and all, having the requisite authority and power of doing something about it, to reflect upon the necessary changes feasible and to take action accordingly.

Some years ago, David Selbourne, an English author, when asked about his impressions of the usage and application of the language in this country as he was touring here had remarked, "aperson not knowing English in India, is like a widow in a marriage ceremony". We are often not able to form the best opinion of ourselves and so prefer someone else to act as our mirror instead. In this case it is certainly not very heartening to note that a Britisher might find mirth at the thought that India has not been able to emancipate itself truly from the shackles of bondage and subjugation that they had once imposed upon us. It is understandable that it takes time to change a system which has the strength of acceptance and establishment. But then it is definitely not desirable that a country of India's capacity and depth of learning should take nearly forty years to realise that the best medium of communication is its own language and not one which is borrowed from another country. Perhaps it is a matter of conjecture to ascertain how long it is going to take the authorities to change the existing system. The officials have to deal with a multifaceted problem of choosing a single medium of exchange from the available twenty-two, hence it may not be totally correct to accuse them of negligence. It is the conjunction of a low level of awareness among the people along with the indecisiveness of the authorities that have rendered the fate of the system that it today has to face.

A scientist when giving a discourse on a particular subject might not pronounce a few words correctly. But then that should not be a criterion for judging his lecture. After all it is the content of the discourse and not the garb in which it is being delivered that should be of interest to the people. It is said that language is like a vehicle which takes a person from one place to another. Our interest should be the person and not the vehicle.

We often find that children watching television or listening to the radio are brought to laughter by the incorrect pronounciations of a few words by the people occupying the limelight. It is this attitude of the youth and subsequently of the adults which needs change. A person might just bluff his way out and still be praised by sections of the youth just because of flowery language and correct diction.

The problem is all the more grave in the less developed areas like the smaller towns and villages of our country. A child learning History through English in India is not only learning History but also English which is an added load. It is common knowledge that the basic of any subject when understood through one's mother-tongue forms a much deeper impression on the mind than when understood through a language over which one has lesser grasping ability In such a situation it becomes a burden than a tool for the attainment of knowledge.

The contention of many teachers of our country today, that the impediment of a foreign language prompts students in general to commit lessons to memory without a clear perception of its meaning or explanation, should be given some credibility when we find extremely few people going in for fundamental research compared to the millions that are receiving education. It is sad if not pathetic that the system is such that it prompts a minimum number of students to go in for the roots or basic of the subjects in the curriculs. Students in general are interested in the superficial knowledge of the techniques with a view of scoring marks in the examinations. But why such techniques are adopted, does not interest the average student, with the result that these are forgotten as soon as the examination is over.

Perhaps it would not be too naive to assume that countries which have produced a greater number of Nobel laureates in the sciences or languages than others, have been able to do so because of the freedom meted out to the people to pursue education through their mother-tongue. It would again be wrong to think that there is no freedom

in our country to do the same, but it is limited in more ways than one. A scholar propounding his learning in his native-tongue does not get as much attention as one who does it through English. Thus we arrive at the same malady—the attitude of the people towards the acceptance of a foreign language as the elitist language ; and not knowing it or being unable to express oneself in it is equivalent to being physically handicapped.

People of the present age experience the great importance of time. The period after the Second World War is often referred to as the 'jet age'. Reflecting deeply one cannot overlook the fact that 'bearing' must receive more attention than speed. If we have our bearings wrong but are moving at a snail's pace our position can be remedied easily. But if we are in the wrong course and are moving at the speed of a jet plane we will land up far from our destination, correction being extremely cumbersome if not difficult.

Compared to the developed countries of the world we are still progressing at a slow rate as far as education is concerned. There are far too many people condemning the educational system and far too few people to do something positive for it. This perfect disharmony between aims and means needs removal. If is time to root hypocrisy out once and for all The students and youth joining hands in a sincere effort to change the obsolete old order and bring in the new, the task should not be too difficult to achieve. Beyond this Indians can be optimistic keeping faith in the philosophy of the old order changeth, yielding place to the new'. Upon the feasibility of such a change, lie all hopes of seeing India's resilience and confidence restored to its past renown.

'DIET AND DIABETES'

—Shampa Chandra

It any one suffers from frequent urination or feels lot of thirst or increased apetite or a sudden fall in body weight or a feeling of tiredness or wounds require more time to heal. Then he must get himself examined at the earliest possible as any one of the above mentioned symptoms is an alarm for him to suspect himself to be suffering from diabetes.

The disease diabetes mellitus, commonly known as sugar disease is qnite prevalent in India and in foreign countries. There is a preponderance of male over female diabetics in India, while it is the other way in western countries. The diabetes mellitus is a Chronic metabolic disorder, with a strong hereditary basis, with high blood sugar and is usually associated with the passge of sugar in the urine.

Insulin is intimately concerned with the metabolism of carbohydrates. It is one of the hormones manufactured by the cells of Islends of langer hans in Pancreas When the level of glucose in the blood increases, insulin is released into circulation and functions in the conversion of glucose to glycogen in liver as well as for the later oxidation of glucose in the tissues.

In a diabetic pesson there is a marked alternation in the metabolisem of lipids (fat) which on one hand causes a downward trend in the synthesis of fafty acids, while on the other hand the rate of oxidation of falty acids is enhemeed. Thus, the ability to dispose of the end products of fatty acids ts reduced. This results in an accumulation of ketones, which is called acidosis or ketosis which may ultimately lead to coma i. e. senselessness. In severe cases, even death may occur. Heredity plays the most important role in the on set of this disease. Increase in body weight is always a denger signal. Destruction of Beta-cells of Pancreas could be another factor. Environmental factors such as stress. infection etc. also contribute to some extent for causing this disease.

The best method of treatment of diabetes is by dietary control. Mostly the diabetes are obese. So the main function of the diet would be to reduce the over weight and bring the individual in normal weight range of his/her age without affecting the normal activities. It is of utmost importance to restrict calories intake in the diet. The adupt diabetes individual must take long walks and light exercise. Besides dietary control and injection of insulin, some oral drugs are now being used for the treatment of diabetes. Two common groups drugs of are sulphony urea and biguanides. These drugs are effective in lowering the blood sugar. They also stimulate the production or release of insulin by Pancreas.

One must not feel disheartened if he is a diabetic. He should get himself regularly examined, should use the appropriate diet and keep himself active.

"নব আনন্দে জাগো
আজি নব রবি কিরণে"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী
আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ